আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা

প্রবোধচন্দ্র সেন

অনিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

১৯৫৪ অক্টোবর

প্রকাশক

শ্রীদ্বিজদাস কর

অণিমা প্রকাশনী

১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক

শ্রীশিশিরকুমার সরকার

শ্যামা প্রেস

২০বি ভুবন সরকার লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীগণেশ বসু

কল্যাণীয়

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমস্নেহভাজনেষু

আমি প্রথমাবধি তোমার একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার অগ্রগতি পরম শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করেছি। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় তুমি বাংলা সাহিত্যের যে সুবৃহৎ ইতিবৃত্ত রচনায় ব্রতী হয়েছ আমি তার শুভ পরিসমাপ্তি দেখে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। তোমার এই মহৎ ব্রত উদযাপনের দ্বারা স্বদেশের কাছে আমাদের সকলের অপরিমেয় ঋণ পরিশোধের অনেকখানি সহায়তা হবে আর তুমি সমগ্র জাতির আশীর্বাদভাজন হবে। তোমার এই শুভ কর্মপথে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাও তোমার সঙ্গী হয়ে থাকুক, এই ইচ্ছার প্রেরণাতেই আমার এই সামান্য গ্রন্থখানি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। ১৮ ভাদ্র ১৩৮৫

শুভানুধ্যায়ী

প্রবোধচন্দ্র সেন

রচনাক্রম

ঘনরসময়ী গভীরা

বক্কিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।

অবগাঢ়া চ পুনীতে

গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ ॥

—সদুক্তিকর্ণামৃত

ঘনরসময়ী বঙ্কিমগতি

পবিত্র-করা জনগণমতি,

গাহনপুণ্যে ধন্য করিয়া ঘুচায় গ্লানি

কবিবন্দিতা গঙ্গানদী ও বাংলাবাণী ॥
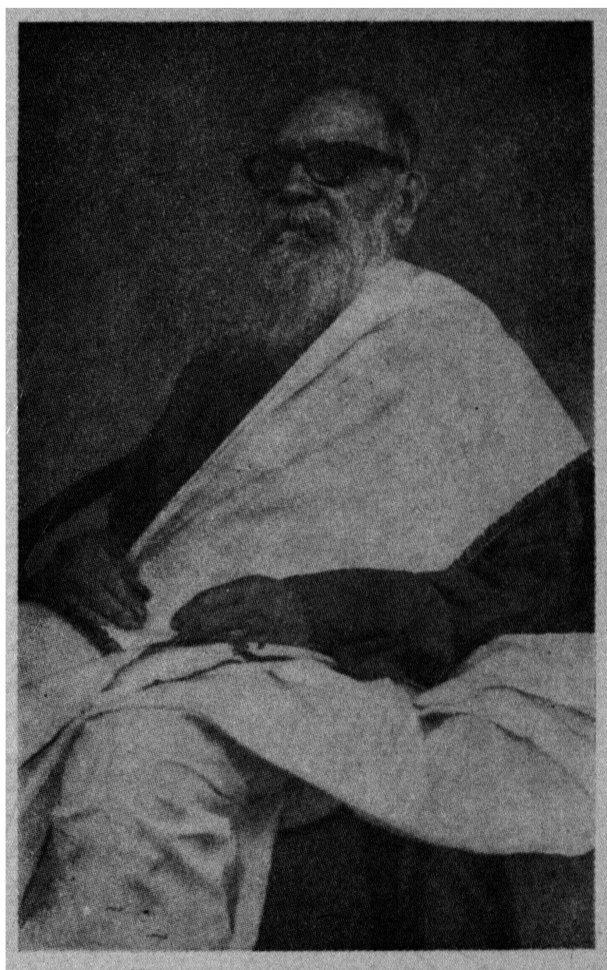
ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতিবক্তৃতা-মালার ষষ্ঠ বক্তৃতা হিসাবে উনবিংশ শতকের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে একটি ভাষণপ্রবন্ধ পাঠ করি ১৯৬৮ সালের ১৯ এপ্রিল শুক্রবারে। বিষয়টি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষেরই অভিপ্রেত। আমি শুধু বেছে নিয়েছিলাম তার গীতিকবিতা বিভাগটি। প্রবন্ধটি পঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধীভবনে। সভাপতি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত কবি শ্রীঅজিত দত্ত। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার পরে এ বিষয়টি সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা ও মতামত প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনস্বী লেখক ও বাগ্মী শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ও সভাপতি শ্রীঅজিত দত্ত।

এই ভাষণপ্রবন্ধটিকে অচিরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি বলে এটিকে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু তাতেও সবটা লেখা এক সংখ্যায় বা পর পর দুই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তাই এটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুই নামে প্রকাশ করা হয়। মূলতঃ এক হলেও এই দুটি ভাগকে দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বলে গণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। তাই বর্তমান গ্রন্থেও এই দুই ভাগের স্বাতন্ত্র্য মেনে নেওয়া হল। তা ছাড়া, ভাবগত সাদৃশ্য ও ধারাবাহিকতার কথা বিবেচনা করে এই দুটি ভাষণপ্রবন্ধের সঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত আরও তিনটি প্রবন্ধকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া গেল। আর, এই পাঁচ প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত ভাবধারার প্রকৃতিগত ঐক্যের কথা মনে রেখে বইএর নাম রাখা গেল 'আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা'। বলা প্রয়োজন যে, 'আধুনিক' শব্দটি এখানে ভাবগত অর্থেই গ্রহণীয়, সংকীর্ণ কালগত অর্থে নয়। কালগত অর্থে আধুনিকতার পূর্ব ও উত্তর দুই সীমাই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ভাবগত অর্থে আধুনিকতার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত স্থিরতার সন্ধান মেলে।

কবি রামপ্রসাদ ও বাউল কবিদের পদাবলী রচনা কোনো কোনো অংশে কতকগুলি সাম্প্রদায়িক গূঢ় ধর্মতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এগুলির আসল লক্ষ্য সম্প্রদায়-বহির্ভূত বৃহৎ জনসাধারণ। আর যেসব বিশেষ গুণে

এগুলি সাম্প্রদায়িকতা ও সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের কালে এসে পৌঁচেছে, আমাদের পক্ষে সেগুলিই মূল্যবান্ এবং বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। তাই এই গ্রন্থে রামপ্রসাদী ও বাউল পদাবলীর শুধু সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিষয় নিয়েই যা-কিছু আলোচনা করেছি। রামপ্রসাদ ও বাউল কবিদের স্বীকৃত ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠানাদিরও অবশ্য কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিন্তু সেই ধর্মের এই বিশেষ দিকটা আধুনিক কালে আমাদের জাতীয় জীবনকে ব্যাপকভাবে বা গভীরভাবে স্পর্শ করে না। অধিকন্তু গীতিকবিতার আলোচনায় সেই ধর্মের দিকটা অপ্রাসঙ্গিক। এসব কারণে এই গ্রন্থে শাক্ত বা বাউল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছি। তা ছাড়া, রামপ্রসাদ এবং অন্য যে-কোনো বিষয়ে যেসব মামুলি 'সমস্যা' বা বিতর্ক প্রচলিত আছে আমি সেগুলি সযত্নে পরিহার করে চলেছি।

সবশেষে এ কথা বলা অনুচিত হবে না যে, এই প্রবন্ধগুলিতে আমি কোথাও প্রচলিত ধারণাকে নির্বিচারে মেনে নিই নি এবং প্রয়োজন মতো প্রচলিত মতের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতেও দ্বিধা বোধ করি নি। আসলে আমি সর্বত্রই ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে তথ্য ও যুক্তির সহায়তায় স্বাধীন ভাবে বিচার-বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আমার সিদ্ধান্তও কেউ নির্বিচারে গ্রহণ করুন তা আমি চাই না। নিত্য বিচার ও পুনর্বিচারই সত্যনিরূপণের একমাত্র পথ বলে আমি বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে, সত্যের প্রকৃতিও কালে কালে বিবর্তিত হয়। কালাতীত নিত্য সত্য কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরির কাজে আমার দুই প্রাকৃতন ছাত্র শ্রীমান্ সুধাংশু-বিমল বড়ুয়া (কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক) ও শ্রীমান্ জয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (কালনা কলেজের অধ্যাপক), এবং বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের যন্ত্রলেখক শ্রীমান্ জানকীনাথ দত্তের সহায়তা পেয়েছি। প্রুফ দেখার কাজে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করেছি আমার আগ্রহী প্রকাশক শ্রীমান্ দ্বিজদাস কর এবং আমার কন্যা শ্রীমতী সুগতা সেনের উপরে। আর নির্দেশিকা তৈরির

দায়িত্বও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন আমার প্রকাশক মহাশয়ই। তাঁদের সকলকেই জানাচ্ছি আমার আশীর্বাদ ও আন্তরিক কল্যাণকামনা। এখানে বিশেষভাবে বলা উচিত যে, শ্রীমান্ দ্বিজদাস করের ন্যায় বিচক্ষণ ও সুদক্ষ প্রকাশক বন্ধুর সহায়তা লাভের ফলেই এই বইটি অনধিক আড়াই মাসে প্রকাশিত হতে পারল। আমার মতো বিগতাশীতি বৃদ্ধের পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে, বিশেষতঃ আমাদের প্রকাশনা-জগতে যখন চরম দুর্যোগ ও কালহরণের পালা চলেছে? তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি ও উদ্‌যোগপরায়ণ ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি কামনা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কেননা, স্বয়ং লক্ষ্মীই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরদান করবেন। 'উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ'। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

সুকুমার চন্দ্র সেন

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা মিটে কি আশা ?
নদ নদী সরোবর,
কিবা বল চাতকীর ?
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা ?

—রামনিধি গুপ্ত

ঊনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা

ঊনবিংশ শতকের বাংলা কবিতার আলোচনায় প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, ওই এক শতাব্দীব্যাপী কাব্যসাধনায় কোনো ধারাবাহিকতা সমগ্রতা বা ঐক্য আছে কি না, অর্থাৎ তার কোনো সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করা সম্ভব কি না। এই সমস্যার একটা প্রচলিত বা প্রায়-সর্বস্বীকৃত সমাধান এই যে, ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য দুটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত— চিরাগত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ধারা এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত নূতন ধারা। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) সঙ্গেসঙ্গে প্রাচীন ধারার অবসান এবং রঙ্গলাল-মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন ধারার সূত্রপাত, এ কথা প্রায় সকলেই বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। বহুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা সকলেই জানেন। তাঁর উক্তি এই—

> "যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রহস্যসন্দর্ভে [বিবিধার্থ-সংগ্রহে] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।
>
> সেই ১৮৫৯-৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়— উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯-৬০ সালের মতো দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।"

—দীনবন্ধু মিত্র : কবিত্ব (১২৮৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির দীর্ঘকাল পরে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, এ স্থলে তাও স্মরণযোগ্য।—

> "বঙ্গসাহিত্য-আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত-কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাবসকলের মধ্যে [illegible] [illegible]

আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ধক্‌ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি একস্থানে বলিয়াছেন—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্‌
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেইপ্রকার দশা ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।"

—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪), নবম পরিচ্ছেদ

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতেরই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য বলে গণ্য হতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধানের সঙ্গেসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় রজনীর অবসান, আর মধুসূদনের ভাস্বর প্রতিভায় প্রদীপ্ত নবপ্রভাতের অভ্যাগম—বাংলা সাহিত্যের এই আকস্মিক যুগ-পরিবর্তনের কথা পরবর্তী কালেও স্বতঃস্বীকার্য সত্য বলে গণ্য হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও নানা স্থানেই তার সমর্থন পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে (১৯৩৮) বাংলা কাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তার একটি অংশ এখানে উদ্‌ধৃত করছি।—

"যারা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এসব কাব্য স্বভাবতঃই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়শুদ্ধ দুদিনে শুকিয়ে যেত। বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

—'বাংলা কাব্যপরিচয়' (১৩৪৫), ভূমিকা

অতঃপর বাংলা সাহিত্যের নূতন ধারার প্রবর্তক হিসাবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র

ও মধুস্থদনের নাম উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায় মধুস্থদনের রচনায়।

এই স্থচিরপোষিত ধারণার সত্যতা বিচার করে দেখা দরকার। ইতিহাসে যুগপরিবর্তন কখনও আকস্মিকভাবে ঘটে না। অর্থাৎ রাতারাতি এক যুগ গিয়ে আর-এক যুগ দেখা দেয় না। পরিবর্তনের গতি কখনও মন্থর, কখনও দ্রুত বা অতিদ্রুত হতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনটা আকস্মিক হয় না। এই দ্রুততা বা মন্থরতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনা-পরম্পরার গুরুত্বের উপরে। বস্তুতঃ ইতিহাসের ধারা নদীপ্রবাহের মতো। ভৌগোলিক পরিবেশের অসমতা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক কারণে নদীর প্রবাহ বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা দিকে এঁকে-বেঁকে চলে, নদীপ্রবাহের এই দিক্‌পরিবর্তন কখনও কখনও তীব্রও হতে পারে। কিন্তু তার জলস্রোতের ধারাবাহিকতা বা ঐক্য অব্যাহতই থাকে, তার ধারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। ইতিহাসের ধারাও তেমনি কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও তার কারণপরম্পরার সম্যক্ উপলব্ধির অভাবে তার দ্রুত দিক্‌পরিবর্তনকে আকস্মিক এবং তার প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হতে পারে। এই ভ্রান্তি সমকালীন লোকের পক্ষেই বেশি হবার সম্ভাবনা। কারণ কালের নৈকট্য হেতু তাদের কাছে পরিবর্তনটাই লক্ষিত হয়, তার নিগূঢ় কারণসমূহ অনেক পরিমাণেই অলক্ষিত থাকে এবং ফলে ওই পরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধিও সম্ভব হয় না। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা ঘটে গিয়েছে তার স্বরূপ বিচারেও এই ভ্রান্তি ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস। একমাত্র বাংলা সাহিত্যের বেলাতেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নীতিতে ব্যতিক্রম ঘটল তা মেনে নিতে স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথের যে উক্তিটি পূর্বে উদ্‌ধৃত হয়েছে তার শেষাংশকে এক হিসাবে প্রথমাংশের প্রতিবাদ বা খণ্ডন বলে গণ্য করা যায়। প্রথমাংশে বলা হয়েছে, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য 'দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন' এবং 'এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত'। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে, য়ুরোপীয় অনুপ্রেরণা-জাত ধারাটিও 'বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ' নয়, সুতরাং তার প্রকৃতিবিরুদ্ধও নয়। যা প্রকৃতিবিরুদ্ধ তা কখনও রুচিসম্মত হতে পারে না। বাঙালির প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় বলেই বাংলা সাহিত্যের এই নূতন ধারাকে অ-ন্যাশন্যাল বা বিজাতীয় বলে গণ্য করা যায় না। যদি যথার্থতঃই তা বিজাতীয় বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ

হত তা হলে এই সাহিত্যধারা বাংলাদেশে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমবর্ধমান হতে পারত না।

নদীর সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসংগম পর্যন্ত প্রবাহিত যে নদী গঙ্গা নামে পরিচিত তার জলধারার সঙ্গে নানা পর্যায়ে ছোট বড় অনেক নদী এসে মিশেছে, তাতে গঙ্গার জলধারার নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, কিন্তু, নদীর ধারাবাহিকতা বা ঐক্য নষ্ট হয় নি, কোথাও বিচ্ছিন্নতাও দেখা দেয় নি। বাংলা-সাহিত্যপ্রবাহ সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির হৃদয়গত ভাবধারার সঙ্গে বহিরাগত ভাবধারার সংগম ঘটেছে, তাতে তার ভাবপ্রবাহের ব্যাপ্তি গভীরতা বৈচিত্র্য ও গতিবেগ বেড়েছে, কিন্তু তাতে তার প্রকৃতিতে কোনো বিকার ঘটে নি। কেননা বাইরের সম্পদকে গ্রহণ করবার শক্তি বাঙালি জাতির ও বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত। বাঙালির প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্‌ধৃত করা যাক।—

> "বাঙালির স্বভাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে।"

—'কালান্তর', দেশনায়ক (১৯৩৯)

এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙালি স্বভাবের শ্রেষ্ঠতা কোথায়। এ বিষয়ে তাঁর আর-একটি উক্তি এই।—

> "পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নবনবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। যত দূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায় নি— বাংলাদেশের এই গৌরব, এই তার সত্য পরিচয়।"

— কালান্তর', মহাজাতি-সদন (১৯৩৯)

অর্থাৎ প্রতিভার নিত্য উন্মেষপরায়ণতা, প্রাণের প্রবল স্পর্শশক্তি এবং বাইরের আহ্বানে সাড়া দেবার ও বাইরের দানকে গ্রহণ করবার সহজ প্রবৃত্তি, এই হল বাঙালি প্রকৃতির সত্য পরিচয়। উনবিংশ শতকে বাঙালি প্রতিভার

প্রথম প্রতিভূ রামমোহন রায়। মনে রাখতে হবে, রামমোহনের কীর্তি ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, বরং দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন অনেকাংশে তাঁরই দূরদর্শিতার ফল। তাঁর বাঙালি প্রকৃতিই তাঁকে দিয়েছিল 'নতুনকে চিনে নেবার এই উজ্জ্বল দৃষ্টি'। ইংরেজিকে আয়ত্ত করবার বহু পূর্বেই আরবি ও ফারসি ভাষার যোগে তিনি তাঁর এই সত্য দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছিলেন। নূতনকে স্বীকার করবার এই সহজাত প্রবণতাই পরবর্তী কালে তাঁকে মূল হিব্রু ও গ্রীক বাইবেলের সত্য নিরূপণে প্রবর্তিত করেছিল। বাঙালি প্রতিভার দ্বিতীয় মুখ্য প্রতিভূ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর প্রতিভাবিকাশও ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, রামমোহনের ন্যায় তাঁরও চিৎপ্রকর্ষের উৎসস্থল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য। অথচ তিনিও কেমন সহজেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন তা কারও অজানা নয়।

বাঙালি মনের এই যে বৈশিষ্ট্য আধুনিক কালে এমন প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেটা পরের কাছে ধার-করা বস্তু নয়, সেটা তার সুচিরকালের ইতিহাসলব্ধ ধন। বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস আমরা শুধু যে জানি নে তা নয়, তা জানবার লেশমাত্র আগ্রহও আমাদের মনে নেই। এটাই বাঙালি চিত্তের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এইজন্যেই আধুনিক কালে বাঙালি প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অজস্র উল্কাপাতের সমবেত দীপ্তির মতো আকস্মিক ও বিস্ময়কর বলে প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্যের চিত্তস্পর্শ বাঙালিপ্রতিভার এই আশ্চর্য স্ফুরণের উদ্দীপক হেতুমাত্র, তার প্রাণের উৎস নিহিত রয়েছে তার অতীত ইতিহাসের মধ্যে। সোনার কাঠির স্পর্শ নিদ্রিত রাজকন্যাকে তার সাতমহলা বাড়িতে জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু মৃত রাজকন্যার দেহে প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রতিভা নিদ্রিতাবস্থায় ছিল বলা যায়, কিন্তু তার প্রাণক্রিয়া নিঃস্পন্দ ছিল না। সে প্রাণশক্তির প্রকাশ পূর্বেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পক্ষে সে ইতিহাস অনুসরণ অনাবশ্যক।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে বাঙালি আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে, সেটা সে পেয়েছে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও বাংলার ইতিহাসের প্রতিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি কিছু দীর্ঘ হলেও এ স্থলে উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি।—

"আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব-প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কি না সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়ে ছিল, তাতে করে তার একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল। এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তা হলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক্ থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত।"

—'জাপানযাত্রী' (১৯১৬-১৭), পরিচ্ছেদ ১৫

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এই উক্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অন্যত্র ('কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৩২৪ ভাদ্র) স্পষ্ট করেই বলেছেন,— "বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি।" বলা বাহুল্য, বাঙালির জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে অভিমত উদ্ধৃত করেছি, তাই এই শ্রদ্ধার হেতু।

পূর্বে বলেছি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-বঙ্কিমের আবির্ভাবকে আকস্মিক ঘটনা বলে স্বীকার করা যায় না। করলে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরই আর-একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক।—

"প্রায়ই জাতীয়-অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎ

ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারি দিকে আয়োজন অনেক দিন হইতেই হয় ; সেই আয়োজনে ছোটো বড়ো অনেকের যোগ থাকে ; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।"

—'ইতিহাস', শিবাজী ও মারাঠা জাতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদন-বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাবের ভূমিকাও যে দীর্ঘকাল ধরে জাতীয়-চিত্তে রচিত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা যদি না হত তা হলে আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে তাঁরা স্বজাতির দ্বারা এমনভাবে অভিনন্দিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে অসাধারণ শক্তি তাঁদের রচনায় সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তারও আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলছিল অনেক কাল ধরেই বাঙালির ভাষাচর্চায় ও সাহিত্য-সাধনায়। একটু পরেই এ বিষয়টা বিশদ করতে চেষ্টা করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে রামমোহন রায়ের কথা একটু বলা উচিত মনে করি। আমাদের দেশে তিনিও একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। তাঁর আবির্ভাবটা অনেকের কাছে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে গণ্য হয়। কিন্তু বাংলার পূর্বাগত চিন্তাধারার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে তাঁর আপাত-আকস্মিক আবির্ভাবেরও সুনিশ্চিত ভূমিকা দেশের চিত্তে রচিত হচ্ছিল দীর্ঘকাল ধরেই।

২

'মধুসূদন ভাহা ইংরেজ।'— বঙ্কিমচন্দ্র এ মন্তব্য করেন মধুসূদনের মৃত্যুর (১৮৭৩ জুন) মাত্র চার বৎসর পরে। তখনও মধুসূদনের দীপ্ত প্রতিভার তীব্র জ্যোতি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিল। এই কালগত অতিসান্নিধ্যই যে ওই প্রতিভার সত্যরূপ উপলব্ধির একমাত্র অন্তরায় ছিল তা নয়। মধুসূদনের বহির্জীবন এবং তাঁর রচনাবলীর বহিরঙ্গের পাশ্চাত্ত্য আবরণও তাঁর অন্তর্জীবন ও সাহিত্য সাধনার সত্যরূপকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', উপনিষদের এই উক্তি মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সে সম্পর্কে সত্যদৃষ্টি পেতে হলে ওই হিরণ্ময় পাত্রকে অপাবৃত করা প্রয়োজন।

মধুসূদনের অন্তর্জীবনের সত্য পরিচয় নিলে দেখা যাবে তিনি যে শুধু ভাহা ইংরেজ ছিলেন তা নয়, তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন ভারতীয়। তার চেয়েও

বেশি, তিনি ছিলেন যথার্থ বাঙালি। যে সংকীর্ণ অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালি ছিলেন সে অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি প্রকৃতির যে সত্য পরিচয়ের কথা বলেছেন সে পরিচয়ের বিচারেই মধুসূদনের মধ্যে বাঙালিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল। সে বিচার আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবু তাঁর কোনো কোনো উক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিদেশযাত্রার পূর্বে স্বদেশের উদ্দেশে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন (১৮৬২) তার নাম 'বঙ্গভূমির প্রতি'। অর্থাৎ জন্মভূমি হিসাবে তাঁর অন্তরের বিশেষ টান ছিল বাংলাদেশেরই প্রতি, ভারতবর্ষের প্রতি নয়। বিদেশে গিয়েও তিনি বারবার বাংলাদেশকে স্মরণ করেছেন। কপোতাক্ষ নদকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—

এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখারীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর শেষ কবিতায় ('সমাপ্তে') তাঁর অন্তরের শেষ কামনাই প্রকাশ পেয়েছে।—

এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ— ভারত-রতনে।

বাংলার গৌরবই যে তাঁর পরম কাম্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর "দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে" ইত্যাদি সমাধিলিপিতে তিনি বাঙালি বলেই পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যে বাঙালি, এটাই তাঁর শেষ পরিচয়। তার চেয়ে বড় পরিচয় তাঁর কাছে আর-কিছু ছিল না। যদি থাকত তবে ওই সমাধিলিপিটি বাংলায় না লিখে ইংরেজিতেই লিখতেন।

তাঁর রচিত সাহিত্যও যে বাংলা সাহিত্যই, বাংলা ভাষার আবরণে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য মাত্র নয়, এ বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করতে চান নি, চেয়েছিলেন নবশক্তি সঞ্চার করতে। সে শক্তির অন্যতম মুখ্য উৎস পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। প্রাণের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে। বাংলার তৎকালীন নিস্তেজ সাহিত্যকে নবতেজে উদ্‌বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও সাধনা। তিনি যে বাংলা সাহিত্যের বাংলা প্রকৃতিকে অব্যাহত রেখেই তাকে নব সম্পদে সমৃদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বহু চিঠিপত্রে ও রচনায়। তাঁর

রচনা থেকে দু-একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯ জানুআরি) মধুসূদনের প্রথম বাংলা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তার একটি অংশ এই—

শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়॥
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়॥

বলা বাহুল্য, এটা ডাহা ইংরেজের উক্তি নয়, যথার্থ দেশপ্রেমিক ভারতীয় তথা বাঙালিরই উক্তি। বেশভূষায় ও আচার-ব্যবহারে ইংরেজের মতো হলেও মধুসূদনের গায়ের রঙ যেমন বদলায় নি, তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হলেও তাঁর মনের রঙও বদলায় নি। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাবে তাঁর অন্তরের ভারতীয় ভাবধারা লুপ্ত তো হয়ই নি, বরং উজ্জ্বলতর হয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। অগ্নিশিখার স্পর্শে যেমন সমস্ত খাদ পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা পাওয়া যায় তেমনি। দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে এই অগ্নিশিখার কাজই করেছে। আজও তার ক্রিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন ব্যাস-বাল্মীকি এবং কালিদাস-ভবভূতির নাম উল্লেখ করেছেন। তাতে বোঝা যায় এই নাটকটির বিষয়বস্তু এবং ভাবাদর্শ তিনি বিদেশ থেকে গ্রহণ করেন নি, করেছেন স্বদেশ থেকেই। তাঁর পরবর্তী সব সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিদেশ থেকে বহু মণিরত্ন আহরণ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নূতন ও বিচিত্র শোভায় প্রসাধিত করেছেন, তার দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত করেছেন। কিন্তু তার

প্রাণবস্তুতে অর্থাৎ ভাবাদর্শে কোনো বিকার সাধন করেন নি। মধুসূদন-কল্পিত সীতা চরিত্র কি বাল্মীকি কালিদাস বা ভবভূতির সীতা থেকে হীনপ্রভ হয়েছে? মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তাকে অভারতীয় বলা যায় না।

শুধু সংস্কৃত নয়, পূর্বতন বাংলা সাহিত্যও যে মধুসূদনের অনুপ্রাণনার অন্যতম প্রধান উৎস এ কথা তাঁর রচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন', এ উক্তি যে কবির ভাবাবেগজাত অতিশয়োক্তি নয় তা তাঁর উক্তি ও রচনা থেকেই সপ্রমাণ হয়। কবির চিত্তে মাতৃকণ্ঠের যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তা এই।—

ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান, তুই, যা রে ফিরি ঘরে।

তার পরে কবির উক্তি—

পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যকে সম্পদ্‌হীন দীন মনে করতেন না। এ সাহিত্যের যে সম্পদ্ তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়। 'বঙ্গভাষা' নামক বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতাটির পরেই স্থান পেয়েছে 'কমলে কামিনী' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' 'কাশীরাম দাস' ও 'কৃত্তিবাস' নামে চারটি কবিতা। তা ছাড়া 'ঈশ্বরী পাটনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' নামে তাঁর আরও দুটি সনেট আছে। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁর মতে পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্ কি এবং এ সাহিত্যে তাঁর প্রেরণালাভের উৎস কোথায়। তা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল তাও অজানা নয়। বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন। সে সাহিত্যকে তিনি কখনও হীনপ্রভ বলেও মনে করেন নি। তাঁর মতো নানা সাহিত্যে কৃতবিদ্য ও অকপটচিত্ত লোকের এই মনোভাবকে নেহাতই দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়।

শুধু সাহিত্য নয়, বাংলা ভাষার শক্তি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অবধি ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি এই— "Believe me,

our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up"। বহুভাষাবিৎ মধুসূদনের এই মন্তব্য শুধু অনুরাগের প্রকাশ নয়, তিনি বাংলা ভাষার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়বান্ ছিলেন। তাঁর উক্তির সত্যতাও ইতিহাসে সপ্রমাণ হয়েছে। তাঁর অন্তরের এই প্রত্যয় কাব্যানুভূতিরূপেও প্রকাশ পেয়েছে।—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!···
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী?···
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নবফুল বাক্যবনে, নব মধুমতী।

—'চতুর্দশপদী কবিতা', ভাষা

এবার নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহিত্যিক প্রেরণালাভের জন্য মধুসূদন একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য ভাবের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন না এবং তাঁর আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতাতেও ছেদ পড়ে নি। যে যুগেই হক আর যে ক্ষেত্রেই হক, শক্তিধর পুরুষের প্রভাবে সব সময়ই মনে হয় ইতিহাসের ধারা-বাহিকতায় ছেদ পড়ল। কিন্তু তা আপাত-প্রতীতি মাত্র, যথার্থ সত্য নয়। গতানুগতিকতার অবসান হলেও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না।

পূর্বে বলেছি মধুসূদন প্রধানতঃ সাহিত্যের বহিরঙ্গকেই পাশ্চাত্ত্য ভূষণে ভূষিত করেছিলেন, তার ভাবাদর্শকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এ কথা তাঁর ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধেও খাটে। তিনি অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে নিরঙ্কুশ ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এ অভিযোগ আছে, কিন্তু তিনি বিদেশী ইডিয়ম আমদানি করেছিলেন এ অভিযোগ শোনা যায় না। এ দিক্ থেকে আধুনিক কালের বাংলাই অনেক বেশি অপরাধী। আজকাল তো দেওয়ালের লিখন, সিংহের ভাগ, অংশ গ্রহণ, সুবর্ণ সুযোগ ইত্যাদি-জাতীয় বিদেশী ইডিয়ম বাংলা ভাষায় ছড়াছড়ি। সে হিসাবে মধুসূদন বাংলা ভাষার শুচিতা রক্ষায় অনেক বেশি নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। অপ্রচলিত ও দুরুচ্চার্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের অভিযোগটাও আসলে ভিত্তিহীন। যাঁরা কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্য, গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী,

রামপ্রসাদের রণরঙ্গিণী কালী-বর্ণনা প্রভৃতি পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের শব্দপ্রয়োগ একটু মন দিয়ে লক্ষ করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, মধুসূদন এ বিষয়ে পূর্বাগত ঐতিহ্যেরই অনুবর্তী, তিনি এ বিষয়ে নূতন কিছু করেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের আড়ম্বর কিছু কম নয়। যে ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র 'শব্দ-ব্যবহারে অদ্বিতীয়' 'শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি' ও 'অপূর্ব শব্দকৌশলী' বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁর রচনাতেও অজস্র বিরলপ্রয়োগ সংস্কৃত শব্দের পুঞ্জীকৃত সমাবেশ দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে মধুসূদনকে ভূরিপরিমাণ সংস্কৃত শব্দ চালাবার দায়ে দায়ী করা যায় না। আরও একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। মৃত্যুঞ্জয়, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা বাংলা গদ্যকে যে শক্তি ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন, মধুসূদন বাংলা পদ্যকেও সে সম্পদে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এটা তাঁর ভাষার গুণই, দোষ নয়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আজও স্মরণযোগ্য।—

> "যদি বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু -প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।"
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খণ্ড), বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে সংস্কৃতবহুল ভাষাপ্রয়োগে স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর-ভূদেবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন, বঙ্কিমসাহিত্য পাঠকমাত্রেরই তা জানা আছে। সংস্কৃতভূয়িষ্ঠ ভাষাব্যবহারের কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের স্থানই বোধ করি সর্বোচ্চে। গদ্য বা পদ্য রচনার এই কুশলতায় আর কেউ তাঁর সমকক্ষতার অধিকারী নন। গদ্যের প্রসঙ্গ থাক, পদ্য রচনায় তিনি যে মধুসূদনের সীমাকে অতিক্রম করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, সেটাই আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক ও স্মরণীয়। 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা' 'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' 'গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে'— এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত বিকীর্ণ হয়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। শুধু কবিতায় নয়, গীতিরচনাতেও এ জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন—

ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা-সিক্ত বায়ে,
মেঘ -মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি-প্রান্তে জ্বলে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি॥

কভু লোষ্ট্রকাষ্ঠ-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতলজল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া॥

ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই দেখা যায়, উচ্চাঙ্গ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত শব্দের আভিজাত্যে সমৃদ্ধ ও তার বিচিত্র ধ্বনিসংগীতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। অক্ষর-ডম্বরই গৌড়ী রীতির বিশিষ্টতা, সংস্কৃত আলংকারিকের অভিজ্ঞতালব্ধ এই অভিমতের সত্যতা বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক যুগেই সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং অক্ষরডম্বরের অপরাধে মধুসূদনকে অভিযুক্ত করা নিরর্থক।

নিছক শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তাই মধুসূদনের রচনার এই সংস্কৃতবাহুল্যের হেতু নয়। তার একটা বিশিষ্ট হেতু আছে। পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় যে অনেক সময় পুঞ্জীকৃত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায় তার প্রধান হেতু ছিল ধ্বনিগত আড়ম্বরবিধান। অনুপ্রাস বা যমক -বাহুল্য এই আড়ম্বরেরই প্রকারভেদ মাত্র। তা ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল দুর্বল বাংলা ভাষায় শক্তিসঞ্চার করা এবং নিস্তরঙ্গ বাংলা ছন্দকে তরঙ্গিত করে তোলা। রবীন্দ্রনাথই বোধ করি মধুসূদনের রচনার এই বিশিষ্টতা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ বিষয়ে নিঃসংকোচে তাঁর অনুবর্তী হয়েছিলেন। মধুসূদনের রচনার এই গুণের কথা তিনি জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করি।—

"মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন — শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।"

—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', সাধনা ১২৯৯ শ্রাবণ

"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত-অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত-অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত-অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।··· মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"

—বিহারীলাল, সাধনা ১৩০১ আষাঢ়

"বাংলা শব্দগুলো বড়ো শান্তশিষ্ট, তারা ধ্বনিকে আঘাত করে তরঙ্গিত করে তোলে না।···এ অভাবটা মধুসূদন খুব অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বেছে বেছে যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের দ্বারাবাংলার এই দুর্বলতাটা দূর করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই তাঁর কাব্যে 'ইরম্মদ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর তাতে ছন্দের মধ্যেও অনেকখানি তরঙ্গায়িত ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে ধ্বনিটা আঘাতে আঘাতে কেমন তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।···বাংলা ভাষার এই সমতলতা, এই দুর্বলতাটা দূর করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে আমিও বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছি।"

—ছন্দবিচার, বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের চেয়ে অধিকতর সচেতন ছিলেন এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে অধিকতর কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'উর্বশী' প্রভৃতি বহু কবিতার শব্দসম্ভারের প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই তা বোঝা যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মধুসূদনের অনবধানতার কথা উল্লেখ করতেও ত্রুটি করেন নি।—

"মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। সাধারণ পয়ারে এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে

অকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

এতগুলি পঙ্‌ক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটিমাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে প্যারাডাইস লস্ট্-এর সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।"

—ছন্দের প্রকৃতি, উদয়ন ১৩৪১ বৈশাখ

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, বাংলা ভাষাকে বলিষ্ঠ ও তরঙ্গিত করবার অভিপ্রায়ে মধুসূদন সংস্কৃতেরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন, বিদেশী উৎসের কাছে অঞ্জলি পাতেন নি।

মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি মিলটনের ব্ল্যাঙ্ক ভর্সকেই বাংলায় চালিয়ে নাম দিয়েছেন 'অমিত্রাক্ষর'। এ ধারণাটা কতখানি সত্য ভেবে দেখা দরকার। মিলটনী অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদান হচ্ছে আয়াম্বিক পেন্টামিটার ছন্দ; তার বহিরঙ্গে আছে দুটি বৈশিষ্ট্য— এক, তার যতিস্বাচ্ছন্দ্য ও প্রবহমানতা; আর দুই, তার মিলহীনতা। পক্ষান্তরে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদান বাংলার স্বকীয় পয়ার ছন্দ, ইংরেজি আয়াম্বিক পেন্টামিটার চালাবার কল্পনামাত্রও তিনি করেন নি। ইংরেজি অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে বাংলা অমিত্রাক্ষরের সাদৃশ্য শুধু তার বহিরঙ্গে। অন্তরঙ্গে বাংলা অমিত্রাক্ষর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। আর মিলহীনতাও আমাদের দেশে অভিনব নয়। সমস্ত বনেদি সংস্কৃত ছন্দই যে মিলহীন, এ কথা মধুসূদন ভালো করেই জানতেন। তবু মিলহীন স্বচ্ছন্দযতি প্রবহমান ছন্দ রচনার আদর্শ মধুসূদন ইংরেজি থেকেই নিয়েছিলেন এ কথা সত্য। কিন্তু যতিস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে তাকে বাংলা ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং নিজের সহজাত ছন্দোবোধের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল, ইংরেজি ভাষা ও ছন্দের গতিপ্রকৃতির উপরে নয়। দুই ভাষার ছন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেঘনাদবধ কাব্যের (চতুর্থ সংস্করণ) 'ভূমিকা'তে (১৮৬৭) ঠিক এ কথাই বলেন।—

"ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্যরচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে।... সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করার প্রথা

প্রচলিত নাই।...তিনি [মধুস্থদন] কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়ম অনুসারেই লিখিয়াছেন।...কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে,...মাইকেলের অমিত্রছন্দে...সকল ছন্দ ভাঙিয়া সকলের বিরামযতির নিয়ম একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই।"

দেখা গেল মধুস্থদন ভাষা এবং ছন্দ-প্রয়োগেও পূর্বাগত ধারা রক্ষা করেই চলেছেন। যেসব ক্ষেত্রে সে ধারাকে মোড় ফিরিয়েছেন সেসব ক্ষেত্রেও তার গতিপ্রকৃতি অব্যাহত রেখেই মোড় ফিরিয়েছেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি বিদেশী ভাষা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন বটে, কিন্তু সে প্রেরণাকেও তিনি বাংলা ভাষা ও ছন্দের শক্তি ও সম্ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েই কাজে লাগিয়েছেন।

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ভাবাদর্শ, ভাষা ও ছন্দ সব ক্ষেত্রেই মধুস্থদন সিদ্ধরস ও সিদ্ধরীতিকে অব্যাহত রেখেই তাকে নূতন পথে প্রবর্তিত করেছেন। সেই-জন্যেই তাঁর কবিকৃতি তাঁর স্বজাতির কাছে এত সহজ স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করতে পেরেছে। যেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধরস ও সিদ্ধরীতি লঙ্ঘিত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেই ত্রুটি ঘটেছে। আর সে ত্রুটি উপেক্ষণীয় বলেও গণ্য হয় নি।

অতএব ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক ধারার অবসান হল, আর মধুস্থদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সে সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক ধারার উদ্ভব হল, এবং এই দুই ধারা পরস্পর থেকে 'সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন', বহুপ্রচলিত এই অভিমতটি স্বীকার্য নয় বলেই মনে করি। নূতন ধারা যদি পূর্বতন ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হত, তা হলে এ ধারা দেশের চিত্তে এমন সহজ স্বীকৃতি পেতেই পারত না। আসল কথা এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পরে নবশিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ অনেকগুলি প্রতিভাশালী ও শক্তিধর পুরুষ প্রায় একসঙ্গে আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সহসা অভূতপূর্ব শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুললেন। গ্রীষ্মকালে নদীর ক্ষীণ ও মৃদুগতি জলধারা যেমন বর্ষাকালের অকুণ্ঠ ঔদার্যের ফলে খরগতি ও কূলপ্লাবী বিপুল স্রোতোধারায় পরিণত হয়, ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও কতকটা সেইজাতীয় পরিবর্তনই দেখা দিয়েছিল। তার ঐক্য বা ধারাবাহিকতায় এবং তার প্রকৃতিগত প্রবণতায় কোনো ছেদ ঘটে নি।

কিন্তু একটা ক্ষেত্রে কিছু আকস্মিকতা ও প্রকৃতিবিরুদ্ধতাই ঘটেছিল বলা যায়। সে হচ্ছে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত বা ইংরেজি

আদর্শের মহাকাব্য রচনার রীতি কোনোকালেই প্রচলিত হয় নি। রামায়ণ-মহাভারত ও চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পাঁচালি বা মঙ্গলকাব্য-জাতীয় যেসব কাহিনীকাব্য প্রচলিত ছিল সেগুলি মহাকাব্যের সগোত্র নয়। সেগুলির জাত আলাদা; সেগুলির উৎস, আদর্শ ও লক্ষ্য ভিন্ন প্রকৃতির। তা ছাড়া সে সময়ে পাঁচালি-জাতীয় কাহিনীকাব্য রচনার ধারাও ফুরিয়ে এসেছিল। অন্নদামঙ্গল রচনার পরে এক শো বছরের মধ্যে ওইজাতীয় কাব্য খুব কমই রচিত হয়েছে। যা-কিছু রচিত হয়েছে তাও বাঙালির স্মৃতিস্বীকৃত ইতিহাসে স্থান পায় নি, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উপজীব্য হয়েই বিরাজ করছে। খোদ ইংলণ্ডেও সে যুগে প্যারাডাইস লস্ট্‌-এর ন্যায় কাব্য প্রত্নরত্নরূপেই সম্মানিত ছিল, অনুসরণযোগ্য সচল আদর্শ বলে স্বীকৃত ছিল না। এই অবস্থায় তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালাতিক্রমণের (anachronism-এর) দুটি অতি উজ্জ্বল ও মহৎ নিদর্শন বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি।

মহাকাব্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল নয়। জীবজগতের বিবর্তনে যেমন মাঝে মাঝে প্রকৃতির খেয়ালের নিদর্শন দেখা যায়, মানুষের মনোজগতের বিবর্তনেও তেমনি মাঝে মাঝে ইতিহাসের খেয়ালের খেলা দেখা যায়। এসব খেয়াল স্থায়ী হয় না, কারণ তা স্বাভাবিক বিবর্তনধারার ব্যতিক্রম মাত্র। উনবিংশ শতকের বাংলা মহাকাব্যের ভাগ্যেও তাই স্থায়িত্ব-লাভ হয় নি। বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য প্রকৃতিতে গীতিকবিতা, কিন্তু আকৃতিতে মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালা, বিভিন্ন সর্গে বিভক্ত। এই কৃত্রিমতার জন্য কাব্যখানিকে ইতিহাসের হাতে মার খেতে হয়েছে। সর্গবন্ধ সমগ্রতার মুখোশ পরে থাকায় তার যথার্থ স্বরূপটি পাঠকসমাজের চিত্তে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। 'সারদামঙ্গল' নামটির জন্যও তাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এই নাম ও আকৃতির কৃত্রিমতা -মুক্ত হয়ে যদি কাব্যখানি বিনা দ্বিধায় স্বতন্ত্র গীতিকবিতার সংকলনরূপে প্রকাশিত হত তা হলে তার আবির্ভাবে বাংলার সাহিত্য-আকাশ অনেক বেশি উজ্জ্বল আভায় উদ্‌ভাসিত হত, বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাসও অনেক বৎসর এগিয়ে যেত। কেননা, গীতিকবিতাতেই ঘটেছে বাঙালি কবিচিত্তের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এবার সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা যাক।

৩

আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণ কি কি, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আধুনিক গীতিকবিতা মুখ্যতঃ আত্মগত ; কবি নিজের ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকেই বিশ্বজনীন করে তোলেন, সে আনন্দ-বেদনা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়জাত হলেও তার প্রকাশ এমন হওয়া চাই যাতে তা সর্বজনের হৃদয়েই সাড়া জাগাতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ এইজাতীয় গীতিকবিতার প্রবর্তক এবং তাঁদের ***Lyrical Ballads*** নামক গ্রন্থেই (১৭৯৮) এই নূতন কাব্যধারার সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশে এইজাতীয় নূতন গীতিকবিতার প্রবর্তক কে ? প্রায় সকলেই একবাক্যে এই কৃতিত্বের সম্মান দিয়ে থাকেন বিহারীলালকে, আর তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যখানি (১২৭৬। ১৮৭০) এই নব্য গীতিকাব্যধারার উৎসস্থল বলে স্বীকৃত। অষ্টম সর্গের প্রথম গীতিটি বাদে এই কাব্যের সবগুলি রচনাই প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৪ এবং ১২৭৬ সালের 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায়। এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'বঙ্গসুন্দরী' পাঠেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ কবিত্বের দীক্ষা লাভ করেন, এ কথা বলা অন্যায় নয়। যা হক, এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার একটি অংশ এই।—

"বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।…সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না,— কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।…

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারিদিকে ঝালাফালা,
উঃ কি জলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন

কখন কখন প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা বিরল এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।

বিহারীলাল···নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। ···এইজন্য তাহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।···

এইজন্য কবি যখন গাহিলেন 'সর্বদাই হু হু করে মন' তখন বালকের [অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথের] অন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল।"

—'আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল (সাধনা ১৩০১ আষাঢ়)

অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গসুন্দরী কাব্যের 'সর্বদাই হু হু করে মন' ইত্যাদি 'উপহার'-নামক প্রথম সর্গটিতেই (১৮৬৭) রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় 'কবির নিজের সুর' প্রথম শুনেছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এটাই কি প্রথম কবির নিজের সুর? রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, 'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না।' সুতরাং এ বিষয়ের ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

অবোধবন্ধু পত্রিকায় বঙ্গসুন্দরী কাব্যের প্রথম সর্গ ('উপহার') প্রকাশের পূর্ব বৎসরেই মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয় (১৮৬৬ অগস্ট)। এইজাতীয় কবিতা রচনার কল্পনা তাঁর মনে দেখা দেয় অনেক আগেই। 'বঙ্গভাষা' নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম খসড়াটি রচিত হয় ১৮৬০ সালে। এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে নানা স্থানেই কবির নিজের মনের কথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তবে চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে কবির আত্মকথা কঠিন ও সংহত হয়ে আসে, তাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস স্ফূর্তি পায় না,— রবীন্দ্রনাথের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনও তা অবশ্যই অনুভব করে থাকবেন। যথার্থ লিরিক বা গীতিকবিতার প্রকৃতি কি তাও তাঁর অজানা ছিল না। মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গ রচনার সময়ে (১৮৬১ প্রথমার্ধ) রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন—

I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad. ···There is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and *I think I have a tendency in the Lyrical way*. (বক্রলিপি আমার)

এই পত্র লেখার কাছাকাছি সময়েই মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' গীতিকাব্যখানি প্রকাশ করেন (১৮৬১ জুলাই)। এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে কবির আত্ম-নিবেদনের বা নিজের আনন্দবেদনার কথা নেই বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই যথার্থ লিরিক্যাল সুর প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ হৃদয়ানুভূতির সংগীত গীতিকবিতা-সুলভ ভাষা ও ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। যেমন—

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হ'লে পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?

—কুসুম

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল,
চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজ-রমণে।…
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল
আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল
মঙ্গল-ধ্বনি !
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি' শ্যামরাজে, সজনি।

—বসন্তে

এসব রচনার ভাষায় ছন্দে ও মিলে নিঃসন্দেহেই উত্তরকালীন রবীন্দ্র-রচিত গীতিকবিতার ক্ষীণ পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। গীতিকবিতার উৎস হিসাবে মধুসূদন যে বৈষ্ণব পদাবলীর শরণ নিয়েছিলেন, এটাও তাৎপর্যহীন নয়। এ ক্ষেত্রেও অগ্রগামিতার মর্যাদা তাঁরই প্রাপ্য।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশের অল্পকাল পরেই মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচিত হয় (১৮৬১ সালের শেষার্ধে)। এটি ১৭৮৩ শকাব্দের (ইং ১৮৬১। বাং ১২৬৮) আশ্বিন-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই।—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধুপানে ধায়,
ফিরাব কেমনে।
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না, একি দায়!

এই কবিতাটিতে কবিচিত্তের বেদনারসধারা অবারিত স্রোতে উচ্ছলিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কবির নিজের মনে যে সুর বেজেছে তা কি সকলেরই হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন জাগায় না? সকলের হৃদয়ে অনুরণন জাগাবার এই যে ক্ষমতা, তাই তো লিরিক কবিতার প্রাণবস্তু। মনে রাখতে হবে এই আত্মবিলাপ কবিতাটি বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের অন্তত: ছয় বৎসর আগে রচিত ও প্রকাশিত। 'সর্বদাই হু হু করে মন' ইত্যাদি রচনায় কবির যে মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' ইত্যাদি আত্মবিলাপে তো তা-ই ধ্বনিত হয়েছে অন্য রূপে ও অন্য সুরে। 'I think I have a tendency in the Lyrical way', মধুসূদনের এই উক্তি নিরর্থক নয়।

'আত্মবিলাপ' রচনার কয়েক মাস পরে এবং বিদেশ-যাত্রার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন আর-একটি গীতিকবিতা রচনা করেন (৪ জুন ১৮৬২)। এটিও সুপরিচিত। নাম 'বঙ্গভূমির প্রতি'। তার প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।...
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে?

অতঃপর বিদেশে গিয়ে তিনি সনেট-রচনাতে আত্মনিয়োগ করেন। গীতিকবিতা

রচনার সুযোগ তাঁর জীবনে আর হল না। অথচ এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা-বিকাশের প্রচুর অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল এবং সর্বশক্তি নিয়ে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। এই অভিপ্রায় সাধনের সুযোগ যে তাঁর জীবনে কখনও এল না, এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও একটা পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়।

৪

এখানে মনে প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ যখন আত্মগত গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বঙ্গসুন্দরী কাব্যকে অগ্রণীত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং বিহারীলালকে 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি' বলে আখ্যাত করেন, তখন তিনি কি মধুসূদনের লিরিক-প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন? মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় কখনও কখনও কবির আত্মনিবেদনের সুর প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু সনেটের নির্দিষ্ট বিধিবিধান ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সে সুর গীতোচ্ছ্বাসে পরিণত হবার সুযোগ পায় নি, এ কথাও তিনি বলেছেন। পক্ষান্তরে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যদি বা কখনও কখনও বেদনার সংগীত উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে, তবু সে বেদনা কবির নিজের হৃদয়জাত নয়। বোধ করি সেজন্যই তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। কিন্তু মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির অগ্রণীত্বের অধিকারকে তো কোনো প্রকারেই উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে এই কবিতাটির কথা সে সময়ে অবগত ছিলেন না তাও নয়। কারণ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩) সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' নামে একটি কাব্যের ছন্দ-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতি থেকে ওই কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করেন।[১] তা হলে বিহারীলালের আত্মগত কবিতার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি এই কবিতাটির কথা উল্লেখও করলেন না কেন? অনবধানতাই কি তার কারণ? আমার বিশ্বাস, তা নয়। সম্ভবতঃ 'আত্ম-বিলাপ'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু ভ্রান্তি ছিল। এই ভ্রান্তি ঘটবারও একটু কারণ ছিল বলে মনে করি। সে কারণটি এই।—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের পাঠকমাত্রই জানেন, ১২৮১ (ইং ১৮৭৪) সালের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় যখন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ওই

১ দ্রষ্টব্য: 'ছন্দ' গ্রন্থের (১৩৭৬) 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ ৪।

১২৮১ সালেরই জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'আর্যদর্শনে' (পৃ ৯১) মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি' ইত্যাদি কবিতাটি মুদ্রিত হয় 'আশার ছলনা' নামে। তার পাদটীকায় ছিল এই মন্তব্যটি—

"আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর মধুসূদন দত্তের ক্লার্ক মহাশয়ের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সাধারণকে উপহার দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণে অতি সমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।"

— আর্যদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯১ পাদটীকা

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও[১] জানতেন না যে, এই কবিতাটি প্রায় তেরো বৎসর পূর্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্মবিলাপ' নামে। তাই একটি অপ্রকাশিত কবিতা হিসাবেই তিনি এটি সাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। এর থেকে এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক যে, কবিতাটি মধুসূদনের শেষ বয়সের, হয় তো মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বের রচনা। আর্যদর্শনের আগ্রহী পাঠক বালক রবীন্দ্রনাথের মনেও বোধ হয় এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কবিতাটি যে তাঁর জন্মের কয়েক মাস মাত্র পরে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা তৎকালে তাঁর জানা থাকা প্রত্যাশিত নয়, বিশেষতঃ যে স্থলে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় নিজেও অনবহিত ছিলেন। মনে হয় পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের বালককালের এই ধারণা অপরিবর্তিতই ছিল। সম্ভবতঃ এজন্যই 'আশার ছলনা' কবিতাটির কথা মনে রেখেও তিনি বিনা দ্বিধায় 'সর্বদাই হু হু করে মন'-কে অগ্রগামিতার মর্যাদা দিয়েছেন।

এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাই। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন যে, লিরিকভাবের প্রতি তাঁর একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সে শক্তিও যে তাঁর ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ মহাকাব্য-রচয়িতা হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল স্বভাবতঃ লিরিকধর্মী, মহাকাব্য রচনায় তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি, এ কথা মনে করা অন্যায় নয়। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন তাঁর মহাকাব্যের ভেরীধ্বনির অন্তরালেও গীতিকবিতার কলধ্বনিই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে। অর্থাৎ মহাকাব্য

১ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)।

রচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁর প্রতিভার স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে। সমালোচকের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বা উপেক্ষণীয় মনে করা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে—তাই যদি হবে তবে মধুসূদন তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রণোদনাকে না মেনে মহাকাব্য রচনার দিকে ঝুঁকলেন কেন? তার উত্তর সম্ভবতঃ এই যে, অল্প-বয়সে তিনি তাঁর শিক্ষকদের কাছে যে সাহিত্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন সে সাহিত্য ছিল মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিকাল ইংরেজি সাহিত্য, তৎকালীন সচল ইংরেজি সাহিত্য নয়। এই শিক্ষালব্ধ অনুরাগই পরবর্তী কালে তাঁকে মহাকাব্য রচনায় প্রবর্তিত করেছিল। বলতে গেলে এটা তাঁর শিক্ষাগত ত্রুটিরই ফল। বাংলা ভাষার প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির বিমুখতার প্রসঙ্গে বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক পত্রে (২৬ জানুআরি ১৮৮৫) তিনি লেখেন— "Such of us as, owing to early defective education, know little of it [Bengali Language] and have learnt to despise it, are miserably wrong"। এই যে শিক্ষার ত্রুটির কথা তিনি বললেন সে ত্রুটি শুধু বাংলা ভাষায় অজ্ঞতার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাও ত্রুটিহীন ছিল না। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষারই পরিণাম মহাকাব্য রচনার আগ্রহ। যদি তৎকালীন সজীব ও সচল ইংরেজি লিরিক সাহিত্য তাঁর শিক্ষায় প্রাধান্য পেত তা হলে সম্ভবতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মহাকাব্যের পর্ব কখনও দেখা দিত না, গীতিকবিতার ধারাই অব্যাহত থাকত।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন[১]— "তিনি যদি···সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।"

বোধ করি মধুসূদন সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে বলা যায়, তিনি যদি সজীব ও সচল অর্থাৎ কালোপযোগী সাহিত্যের শিক্ষা পেতেন তা হলে তাঁর প্রতিভাবলেই বাংলা সাহিত্য আরও অনেক দূর অগ্রসর হত, বাংলা গীতিকবিতার উন্নতি ত্রিশ বৎসর এগিয়ে যেত। মধুসূদনের প্রবর্তনা না পেলে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কখনও মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হতেন কি না সন্দেহ। মহাকাব্য রচনা তাঁদের পক্ষেও কৃত্রিম প্রচেষ্টারই ফল। তাঁদের প্রতিভাও যে মহাকাব্যের চেয়ে গীতিকবিতারই বেশি অনুকূল তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। আমার

১ ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা।

বিশ্বাস, মহাকাব্যের পর্বটি বাংলা কাব্যের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম এবং বাঙালি কবিপ্রতিভার স্বধর্মচ্যুতির একটা আকস্মিক ও বিস্ময়কর নিদর্শন রূপেই ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ('ক্ষণিকা', ক্ষতিপূরণ) আছে—

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে—
ছিল মনে।
ঠেকল কখন তোমার কাঁকণ-
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়॥

এক-এক সময় মনে হয় মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার কল্পনাটি যদি কোনো অভাব্য দুর্ঘটনায় ফেটে গিয়ে হাজার গীতে পরিণত হত তবে মহাকাব্য লাভের গৌরবে বঞ্চিত হয়ে আমাদের যে মর্যাদাহানি ঘটত, বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে কি তার ক্ষতিপূরণ হত না? আর কিছু না হক, তাতে বাংলা গীতিকবিতার স্রোতোধারা যে অবিচ্ছিন্ন থাকত এবং তার বিস্তার ও গভীরতা যে বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ নেই।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিকথা

গীতিকবিতা দিয়েই মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের আরম্ভ। শর্মিষ্ঠা নাটকের 'প্রস্তাবনা'-নামক কবিতাটি তাঁর প্রথম গীতিকবিতা বলে স্মরণীয় হবার যোগ্য। কবিতাটি অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাব ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। এটিতে স্বদেশ-প্রীতির আবেগসঞ্জাত যে বেদনাময় লিরিক সুর বেজে উঠেছে তাও স্মরণীয়। শর্মিষ্ঠা নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে জানুআরি মাসের মাঝামাঝি সময়ে (৬ তারিখের পরে ও ১৯ তারিখের পূর্বে) অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯ জানুআরি ২৩) কয়েক দিন মাত্র পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্ত বোধ করি শর্মিষ্ঠা নাটক দেখে যাবার সুযোগ পান নি। যদি দেখে যেতেন তা হলে তিনি সহজেই মধুসূদনের ওই প্রস্তাবনাটির ছন্দে নিজের অন্তরেরই প্রতিস্পন্দন অনুভব করতেন।

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়,
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়।

—ভারতভূমির দুর্দশা

জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞান হত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে?

. .

দেশের দারুণ দুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসি ছাঁদে
শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥

—ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমায়ো না আর॥

তোল তোল তোল মুখ, খোল রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন ॥···
রাত্রি আর কিছু নাই, হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার—কুয়াশার ঘোর ॥
তিমিরে রবির ছবি আছে আচ্ছাদন।
তুষার উষার শোভা করেছে হরণ ॥
ঈষৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা।
এখনি মেলিলে আঁখি স্থির যাবে দেখা ॥
কু-আশার এ কুয়াশা কত আর রবে।
প্রভাকর-প্রকাশেতে সব দূর হবে ॥···
একেবারে হবে তায় ভারতের ভালো।
দশ দিকে দীপ্ত হবে কুশলের আলো ॥

—ভারতের অবস্থা

কিংবা

পরাধীন ভারতের প্রিয়পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত?
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস।
এখনো হরিছ কাল হইয়া অলস?
উঠ উঠ শয্যা ছাড়, শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥
এখন আলস্য নহে বিধান-বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥

—ভারত-সন্তানের প্রতি

ঈশ্বর গুপ্তের এসব উক্তির সঙ্গে মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের উল্লিখিত 'প্রস্তাবনা'র এই অংশটা মিলিয়ে দেখুন—

শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে' উদয় ॥

দুই জনের কণ্ঠে একই সুর। অথচ একটু পার্থক্যও আছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বেদনার ছায়া গাঢ়তর এবং তাঁর 'জননী' সম্ভাষণের আন্তরিকতাও গভীরতর। তা ছাড়া, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় বেদনার মধ্যে বলিষ্ঠ আশাপরায়ণতার সুরও ধ্বনিত হয়েছে স্পষ্টতর ভাষায়। তবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে উভয়ের মনোভাবের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি—

আমাদের এই বঙ্গ কোনক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গরসে ভরা।
কিংবা
যতেক বাঙালীগণ কাঙাল সকল জন,
বাঙালীরে বিধাতা বিমুখ।

আর মধুসূদনের উক্তি—

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

এই দুএর তুলনা করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বাংলাদেশের প্রতি মধুসূদনের অন্তরের শ্রদ্ধা প্রীতি ও মমতা ছিল গভীরতর। ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই বলেছেন— 'স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত, বিদেশেতে অধিবাস যার।' বিদেশের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছিল নিবিড়তর। বোধ করি বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আন্তরিক টানের এটাও ছিল একটা বড় কারণ। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের মমতাবোধ মধুসূদনের চেয়ে কম ছিল না। মাতৃভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের মনোভাবের বিষয় সকলেই জানেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তই যে ছিলেন অগ্রণী, বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা স্মরণ করার প্রয়োজন আছে। মাতৃভাষা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব পদ্যের চেয়ে তাঁর গদ্যরচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। কিন্তু পদ্যরচনায় তাঁর হৃদয়স্পন্দন অনুভব করা যায় স্পষ্টতর রূপে। এ প্রসঙ্গে তাঁর—

মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।
এবং
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ।

এই দুটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের আসল পার্থক্য নিহিত ছিল তাঁদের সমগ্র সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে— এক জনের উদ্দিষ্ট দেশের সর্বসাধারণ, আর-এক জনের উদ্দিষ্ট শুধু শিক্ষিতসম্প্রদায়। মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য লিখেছিলেন প্যারাডাইস লস্ট-পড়া নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদের জন্য, আর ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতাবলী লিখেছিলেন প্রধানতঃ শুধু বাংলা-জানা পাঠকসাধারণের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদনের শিক্ষা ও মনোভঙ্গিগত এই পার্থক্য তাঁদের রচিত সাহিত্যের রস ও রূপকে প্রভূতপরিমাণেই প্রভাবিত করেছিল। এই রস ও রূপের পার্থক্যের বিষয় বাদ দিয়ে যদি তাঁদের হৃদয়জাত অনুভূতিগুলির কথা বিচার করা যায় তা হলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অন্তরের আনন্দবেদনার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, একই কালধর্ম উভয়ের চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে তাঁদের আনন্দবেদনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ স্থলে সে বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বলেই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাতে দুটি সুফলও ফলেছিল। প্রথমতঃ, ইংরেজি শিক্ষার আভিজাত্য ছিল না বলেই তিনি সর্বসাধারণের কবি হতে পেরেছিলেন, সর্বস্তরের পাঠকই তাঁকে আপনজন বলে, নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সাধারণ পাঠক তাঁর রচনায় যে সুহৃৎসুলভ সহৃদয়তার স্বাদ পেত তাতে সকলেই তাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্বসাধারণের কবি হবার এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল, পরবর্তী কালে মধুসূদনপ্রমুখ 'শিক্ষিত' কবিসাহিত্যিকরা কেউ সে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারেন নি। তাঁরা ছিলেন শিক্ষাভিজাত ও শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের কবি, তাঁরা সর্বসাধারণের কবি হতে পারেন নি। তাঁদের উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ছিল শিক্ষিত সমাজেরই সম্পদ, সকলের নয়। উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের প্রভাবে সমগ্র জাতিটা যে উঁচুনিচু দুই স্তরে বিভক্ত হয়ে গেল, এটা দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সহায়ক হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোক তাঁকে আপনার কবি বলে গ্রহণ করার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র সকলের চিন্তা ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করবার এবং প্রয়োজনমত সকলকে একভাবে উদ্‌বুদ্ধ করবার ও এক আদর্শের অভিমুখে প্রেরণা দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন ; কেননা, সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাঁকে সকলের গুরুর আসনেই বসিয়েছিল। তিনি যে সব সময় সে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতেন কিংবা গুরুর আসনের মর্যাদা রক্ষা করতেন তা

বলা যায় না। কিন্তু অনেক সময়েই করতেন এবং তার ফলে তাঁর কণ্ঠে যে সহৃদয় গুরুর সুর ফুটে উঠেছে তার মূল্যও কম নয়। যেমন—

জান না কি জীব তুমি জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
...
তোমার প্রসূতি যেই তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥[১]
...
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ-সার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥

—স্বদেশ

এর সুর আত্মগত নয়, এ সুর গুরুর সুর। কিন্তু তা হলেও তার মধ্যে যে একটি সুকোমল প্রীতি ও সুগভীর বেদনার রসধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার মূল্য কম নয়, তার লিরিকমাধুর্যও অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় অংশটিতে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর যে ক্ষীণ পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে, সহৃদয় পাঠকের কানে তাও সহজেই ধরা পড়ে।

মোট কথা, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় লিরিক গীতিকার সুর কখনও বাজে নি এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সে সুর পূর্ণবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। লিরিক কবিতার উপযোগী বিষয়বস্তু— ঈশ্বরভক্তি, মানবিকতাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, এসবও ছিল তাঁর আয়ত্তে, সেসব বিষয়ের প্রতি আন্তরিক অনুরাগও তাঁর ছিল, তবু তাঁর রচনায় লিরিকের স্রোত অব্যাহত গতিতে বয়ে যেতে পারে নি। সে স্রোত প্রায়শঃই অনুপ্রাস-যমকের উপলখণ্ডে

১ স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি— 'জনকজননী-জননী' ('কল্পনা' কাব্য, ভারতী ১৩০৩ পৌষ)।

ব্যাহত হয়ে বেগহীন, এমন-কি লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়ে গিয়েছে। তার কারণ কি? কারণ সুশিক্ষাজাত সুরুচি ও শিল্পবোধের অভাব এবং সহজ উপায়ে লোক-রঞ্জনের আগ্রহ। তা ছাড়া গুরুগিরির আগ্রহটাও অনেক সময় তার অন্তরায় ঘটিয়েছে। এজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তাঁর 'প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই, প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন'। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ না পেলেও তাঁর মধ্যে যে লিরিক অনুভূতি ও শক্তি ছিল তার বহু নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনাবলীতে। সেসব খণ্ড খণ্ড নিদর্শন সংকলিত হলে তাঁর প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু সে প্রতিভা ও শক্তির পূর্ণ পরিণত ফল পাওয়া গেল না বলে আক্ষেপও করতে হবে।

দেখা গেল, মধুসূদনের লিরিকপ্রতিভার বিকাশ ঘটতে পারে নি এক ধরনের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাবে, আর ঈশ্বর গুপ্তের লিরিকপ্রতিভাও মেঘাচ্ছন্ন রয়ে গেল অন্যবিধ শিক্ষা (বা অশিক্ষা) ও সংস্কারের ফলে। সেজন্যই বিহারীলাল বাংলা গীতিকবিতার ধারায় পূর্ণবেগ সঞ্চারের গৌরবলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তা বলে এ কথা সত্য নয় যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লিরিক সুর তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শোনা গেল।

মধুসূদন ও ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বতন যুগের দিকে আর-একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, তখনও বাংলা সাহিত্যকুঞ্জে লিরিক কবিতার পিকধ্বনি একেবারে অশ্রুত ছিল না। যথাস্থানে তারও একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাবে।

ঈশ্বর গুপ্ত সুশিক্ষা ও মার্জিত শিল্পরুচি থেকে বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু সহজাত প্রতিভাবলে তিনি যুগধর্মকে অনায়াসেই অধিগত করতে পেরেছিলেন। তাই আধুনিক সাহিত্যের অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণই তাঁর রচনায় এত সহজে ফুটে উঠতে পেরেছিল। তাঁর কালটা যে খণ্ডকবিতারই কাল, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের কাল নয়, তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কখনও অন্নদামঙ্গল বা বাসবদত্তা, পদ্মিনী-উপাখ্যান বা তিলোত্তমাসম্ভবের মতো কাহিনীকাব্য রচনার কল্পনাও করেন নি। এই সহজবোধ না থাকলে তিনি হয়তো সে পথে অগ্রসর হয়ে ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হতেন। শ্রমসাধ্য বৃহৎ কর্মে ব্রতী হবার ক্ষমতা যে তাঁর ছিল না তা নয়। তার প্রমাণ তাঁর কবিজীবনী-সংগ্রহ ও বোধেন্দুবিকাস নাটক। কিন্তু তাঁর পদ্যরচনাশক্তিকে সে দিকে চালনা করেন নি। এটা তাঁর সহজাত যুগধর্মানুভূতিরই পরিচায়ক। কবিতার বিষয় নির্বাচনেও তাঁর এই যুগানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবোধের কথা ছেড়ে দিই, কেননা, এ বিষয়টা চিরকালের, কোনো বিশেষ কালের নয়। প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতিবর্ণনা সর্বকালের হলেও একালে তা একটি বিশেষ রসে ও রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। পূর্বতন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রীতি বিরল, প্রকৃতিবর্ণনাও এত দুর্বল ও একঘেয়ে যে তাকে আমাদের সাহিত্যের একটা বড় দৈন্য বলেই স্বীকার করতে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই এ দৈন্য মোচনের প্রথম প্রয়াস দেখা গেল। তাঁর অন্তরে যে প্রকৃতির প্রতি একটা গভীর অনুরাগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অনুরাগ কখনও গীতিকবিতার আবেগে পরিণত হতে পারে নি। ফলে তাঁর অনুরাগ বিশুদ্ধ বর্ণনাতেই পর্যবসিত হয়েছে এবং সে বর্ণনা কবির হৃদয়রসে অভিষিক্ত নয়। কিন্তু যথাযথ বর্ণনারও একটা কাব্যমূল্য আছে। এই কাব্যমূল্যই ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃতিবর্ণনার মূলধন। দুঃখের বিষয় মার্জিত শিল্পরুচির অভাবে তাতেও অনেক সময় স্থূলতা দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় আধুনিক যুগের যেসব বিশিষ্টতা দেখা দিয়েছে তাতে বাংলা সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধিই হয়েছে সন্দেহ নেই।

তার পরে নারীপ্রেম। নারীপ্রেম সাহিত্যের একটি চিরন্তন উপজীব্য। মানুষের জীবনে, এই প্রেমের গুরুত্ব কতখানি ঈশ্বর গুপ্ত যে তা জানতেন না তা নয়। তাঁর রচনাতেই তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁর জীবনে যথার্থ অনুভূতিতে পরিণত হবার সুযোগ পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র তার কারণ নির্দেশ করেছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে ছন্দস্পন্দনের সঙ্গে হৃদয়স্পন্দনের সাযুজ্য-সাধনের সৌভাগ্য ঈশ্বরচন্দ্রের কখনও হয় নি। এই রিক্ততাই তাঁর রচিত সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দীনতা। তা ছাড়া প্রকৃতিপ্রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যে তাঁর হৃদয়াবেগের অভাব দেখা যায়, তাঁর জীবন ও সাহিত্যের এই রিক্ততাই বোধ করি তারও একটি প্রধান হেতু।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব স্বদেশপ্রেম, সমাজচিত্রণ ও হাস্যরসের কবিতা রচনায়। এই তিনটি বিষয়েই তাঁর কালোপযোগী দৃষ্টি ও মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। এখানেই তিনি আধুনিক কালের কবি।

তাঁর স্বদেশপ্রীতি আন্তরিক ও সুগভীর। এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের মর্যাদা ও গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলা কাব্যে স্বদেশপ্রীতির যে বান ডেকে এসেছিল তার আদি উৎস পাই তাঁরই কবিতাবলীতে। দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। নূতন উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের

স্বদেশকল্পনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তার একটু পরিচয় না দিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে। ভাবী ভারতের সমুজ্জ্বল গৌরবের কথা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখা দিয়েছিল, এ কথা আজ বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। স্বাধীনতার কথা তাঁর রচনায় বারবারই দেখা দিয়েছে। অতীত কালের স্বাধীন ভারতের চিত্রকল্পনায় যেমন তাঁর বুক থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস নিঃসৃত হয়েছে, তেমনি ভাবী স্বাধীন ভারতের গৌরবের চিত্রকল্পনাও তাঁর অন্তরে সুখময় স্বপ্নের মোহ জাগিয়েছে। বর্তমান পরাধীনতার বেদনা ও বিগত স্বাধীনতার গৌরবস্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়কে কত গভীরভাবে আলোড়িত করত তার একটু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধে (সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১)।—

> "আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়াছে। এই কাল রাঙ্গার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্বাণ করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম কোথা? সে কর্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগই বা কোথা? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন!"
>
> —ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'কবিজীবনী' (১৯৫৮), পৃ ৫৫

লক্ষ করার বিষয়, রাঙামুখো বিদেশী ইংরেজের শাসনকালকেই ঈশ্বরচন্দ্র যথার্থ পরাধীনতার কাল বলে নির্দেশ করেছেন। তার পূর্ববর্তী কালের স্মৃতি তাঁর কাছে এত বেদনাবহ ছিল না। তাই ইংরেজ-শাসনের অবসানে নবোদিত স্বাধীন ভারতের কল্পনায় তাঁর মুগ্ধ হৃদয় বিভোর হয়ে ছিল। তাঁর এই মোহময় কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে ছন্দোময় পদ্য রচনায়। যেমন—

স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে ভারতের জরা-দেহে
করিবেন শোভার সঞ্চার॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তিজল হবে বরষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্বার পূর্বসুখ সহকার
প্রাপ্ত হবে জীবন-যৌবন॥

...

এরূপ স্বপন যত কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে, প্রসূতির হাহারবে
সুত সবে করে হাহাকার ॥

—ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

ঈশ্বরচন্দ্র বর্তমান পরাধীনতার দুঃখে মর্মবেদনা অনুভব করেছেন, ভাবী স্বাধীনতার স্বপ্নে মুগ্ধ হয়েছেন এবং সে স্বপ্নকে সফল করে তোলবার জন্য স্বদেশবাসীকে কর্মের প্রেরণাও দিয়েছেন। শুধু কবিতায় নয়, গদ্যরচনাতেও ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় উৎসাহ সঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর এই প্রেরণাবাক্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।—

"যে মনুষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহিত না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।...অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি জাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের জন্য প্রযত্ন করেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"[১]

কিন্তু 'স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের' জন্য স্বজাতির প্রতি এই যে প্রেরণা, তাতে তিনি দুর্বার বন্যাবেগের শক্তি সঞ্চার করতে পারেন নি। পরাধীনতার মর্মজ্বালা ও স্বাধীনতার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের অন্তরকেও আকুল করে তুলেছিল (স্মরণীয় 'ভারতভূমি' ও 'আমরা' -নামক চতুর্দশপদী কবিতা-দুটি), কিন্তু তাঁর রচনাতেও কর্মপ্রেরণার প্রবল শক্তি দেখা দেয় নি। সে সময় তখনও আসে নি। এসেছিল আরও কিছুকাল পরে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার (১৮৬৭) সময় থেকে।

নিখুঁত সমাজচিত্র রচনার মূলেও ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের এই স্বদেশানুভূতির প্রেরণা। স্বদেশকে ভালোবাসতেন বলেই সমাজের সবরকম রীতিনীতি এবং আচারব্যবহারের খুঁটিনাটিগুলিও এমন মমতামাখা দৃষ্টিতে দেখতে ও এমন

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪ বৈশাখ ১৩৭৮, 'দিনের বাণী'। ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তিটি তাঁর কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃত এবং তার তারিখ কি তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি। তবে এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমাংশটি স্বতঃই স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর 'স্বদেশ' কবিতার 'স্বদেশের শাস্ত্রমতে চল সত্য-ধর্ম পথে, সুখে কর জ্ঞান-আলোচন' এই পঙ্‌ক্তিটি। সম্ভবতঃ উক্ত গদ্যাংশ ও 'স্বদেশ' কবিতা কাছাকাছি সময়ের রচনা।

সুনিপুণভাবে চিত্রিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই নৈপুণ্যের বিশদ পরিচয় দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরসের মূলেও আছে এই মমতাভরা সমাজদৃষ্টি। সমাজের প্রতি মমতা ছিল বলেই সমাজের দোষত্রুটিগুলি তাঁর হৃদয়ে জাগাত সুতীব্র বেদনা। তাঁর হাস্যবিদ্রূপের মূল উৎস এই মমতাজাত বেদনা। ঈশ্বর গুপ্তের হাসি নির্মম ছিল না, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। মমতাহীন নিষ্ঠুর হাসি জীবনে যেমন স্পৃহনীয় নয়, সাহিত্যেও তেমনি অকাম্য। আর অহেতুক লঘু হাস্য যদি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত না হয় তবে তা কখনও ক্ষণিকতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। বিশুদ্ধ মিষ্টতার চেয়ে অম্লতামিশ্রিত মিষ্টতারই স্বাদমূল্য বেশি। তেমনি করুণরসমিশ্রিত হলেই হাস্যরসের স্বাদমূল্য বাড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এইজাতীয় হাস্যরসের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

দূর হউক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভাণ।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরমতাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।

—'মানসী', দেশের উন্নতি

ঈশ্বর গুপ্তও অনুরূপ মনোভাবই পোষণ করতেন। এটাই তাঁর হাসির মূলরহস্য। এ কথা মনে না রাখলে তাঁর হাস্যরচনাগুলির যথার্থ মূল্যনিরূপণ সম্ভব হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'পৌষড়ার গীত' রচনাটির কথা উল্লেখ করা যায়। এটিতে হাসির স্পর্শে দুঃখের চিত্র যেন এক অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এরকম অশ্রুসিক্ত হাসির দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু হাসির কবিতা নয়, হাসির গানও রচনা করেছেন। তাতেও হাসিকান্নার যে সমাবেশ ঘটেছে তা তৎকালের পক্ষে অভাবনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। হাসির কবিতা ও হাসির গান-রচয়িতা হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তকে

আধুনিক যুগের অগ্রদূত বলেই স্বীকার করতে হবে। পরবর্তী কালে এজাতীয় রসমিশ্রণের চরম পরিণতি দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায়। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের অনুবর্তীদের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য।

আরও একটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আধুনিকতার যুগলক্ষণ সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি হল সমকালীন ঘটনাকে কবিতার উপজীব্যরূপে ব্যবহার করা। তাঁর রচিত এজাতীয় কবিতা এতই সুপরিচিত যে, তার বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী কালে হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল-প্রমুখ অনেকেই এজাতীয় কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যসাধন করেছেন। কিন্তু এ পথের প্রথম পথিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র, বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও আমাদের স্মরণীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বকালচেতনার সঙ্গে অতীতচেতনাও যুক্ত ছিল। তাঁর এই অতীতচেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গদ্যরচনায়, বিশেষ করে তাঁর কবিজীবনীগুলিতে। কিন্তু তাঁর পদ্যরচনাতেও নানা স্থানে তাঁর ইতিহাস-চেতনার আভা পড়েছে, তাতে স্থলবিশেষে তাঁর রচনার ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, তাঁর এই অতীতচেতনা ছিল আন্তরিক অনুভূতিময়, নিছক জ্ঞানের প্রকাশমাত্র নয়। এ ক্ষেত্রেও তাঁকেই অগ্রবর্তিতার মর্যাদা দিতে হবে। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কারও রচনায় ইতিহাসচেতনা এরকম বাণীরূপ পেয়েছে বলে জানি না। পূর্বযুগে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে (বিশেষতঃ তার মানসিংহ খণ্ডে) এবং গঙ্গারামের মহারাষ্ট্রপুরাণে ইতিহাসজ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে জ্ঞান কবিহৃদয়ের অনুভূতিতে পরিণত হয় নি। সে অনুভূতির বাণী প্রথম ধ্বনিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের কণ্ঠেই। সে বাণী ক্ষীণ এবং অর্ধস্ফুট, কিন্তু তা হলেও তার আধুনিক সুরটিকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

শুধু স্বকাল ও অতীত কাল নয়, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ভাবী কালেরও কিছু ছায়াপাত ঘটেছিল। এখন তারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব।

১২৮৩ (ইং ১৮৭৬) সালে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৯-৬০ সালকে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে 'নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল' বলে বর্ণনা করেন। কেননা, এই সময়েই "পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের অবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।" ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতন দলের 'শেষ কবি', এটাই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা নয়। কারণ ১২৯২ (ইং ১৮৮৫) সালে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলেন, "যাঁহারা বিশেষ

প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।" তার মানে ঈশ্বর গুপ্ত পুরাতনের কালসীমা পেরিয়ে নূতনের এলাকাতেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এই অগ্রবর্তিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের 'তীব্র ও বিশুদ্ধ' দেশবাৎসল্যের বিষয় উল্লেখ করে বলেন—

"নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার [১৮৮৫] কয়জন লোক ইহা বুঝে ?"

দেখা যাচ্ছে পুরাতনের 'শেষ কবি' ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক ভাবধারার বিচারে আপন যুগকে বহু বৎসর পেছনে ফেলে বঙ্কিমচন্দ্রেরও শেষজীবনের সমকালবর্তী বলে গণ্য হতে পেরেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মধুসূদনের এই উক্তি মনে আসে—

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।...
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে আছে—

শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পর সদা।

('স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' ইত্যাদি গীতাবচনও স্মরণীয়।) উদ্ধৃত অংশটি অবশ্য মেঘনাদের মুখে বসানো। কিন্তু তাতে যে মধুসূদনের আন্তরিক অনুমোদন ছিল তাও সংশয়াতীত। মেঘনাদের মুখে বসানো এই উক্তিটি যে ঐকান্তিক দেশপ্রেমিক মনস্বী রাজনারায়ণেরও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল, এ প্রসঙ্গে সে কথাও মনে রাখা উচিত।

ঈশ্বর গুপ্তের 'দেশের কুকুর ধরি' এবং মধুসূদনের 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ'

ইত্যাদি উক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে 'খাঁটি বাঙালী' এবং 'ভাহা ইংরেজ' একই মনোভাব পোষণ করতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের এই দুটি কবিতাংশে যে মনোভাবের পরিচয় পাই, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই জানেন সে মনোভাবের মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে। নিদর্শনস্বরূপ—

ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

—'চৈতালি', পরবেশ

তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর,
কেন তাহা ভুলি।
পরধনে ধিক্ গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষাঝুলি!

—'কল্পনা', ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয়।...
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো।

—'উৎসর্গ', সংযোজন ১২

তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা।

—'উৎসর্গ', সংযোজন ১৩

ইত্যাদি তাঁর বহু রচনাংশই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সুতরাং অন্ততঃ এই একটি বিষয়ের বিচারে ঈশ্বরচন্দ্র যে আপন সময়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী অগ্রবর্তী ছিলেন, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

শুধু তীব্র দেশবাৎসল্য নয়, বিশুদ্ধ রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে ভাবীকালের অভিসঙ্করণধ্বনি ঈশ্বর গুপ্তের অনুভূতিতন্ত্রীতে প্রতিরণিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই—

"ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। সুতরাং নিরস্ত হইলাম।"

এখানে 'উদার' শব্দটি বিচক্ষণ বা দূরদর্শী অর্থে গ্রহণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতির বিশদ পরিচয় দিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে নিরস্ত হলেন, সে কি শুধু বেশি কথা বলার ভয়ে? না তার অন্য কারণও ছিল? এ বিষয়ে কল্পনা করে লাভ নেই। সুখের বিষয়, এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও অন্য প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গপ্রিয়তার প্রসঙ্গে তিনি এক স্থলে বলেছেন—

"মহারানীর স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কান ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল্ বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা, গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না।"[১]

ঈশ্বর গুপ্তের অন্য একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তাতে 'আমাদের ঢেরা সই রহিল'। তার পরেই উদ্‌ধৃত হয়েছে উল্লিখিত অংশটি। তাতেও যে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অনুমোদন ও 'ঢেরা সই' ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'পলিটিক্‌স্'-নামক কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রে তিনি দেশী Agitator-দের প্রথমে চিত্রিত করেছেন 'শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর' রূপে। বলা বাহুল্য, 'শ্বেতকৃষ্ণ'

১ ঈশ্বর গুপ্তের মূলরচনা ও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্‌ধৃতিতে বানানগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এখানে মূলের বানানই অনুসৃত হল। দ্রষ্টব্য বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ' (১২৯২), পৃ ১০১, বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকাতে ('ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'), এবং ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উক্ত ভূমিকা (১৩৭৫। ইং ১৯৬৮), পৃ ৩১।

বিশেষণটির দ্বারা তৎকালীন কালো সাহেবদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। আর কুক্কুর শব্দের ব্যঞ্জনাও সুস্পষ্ট। যা হক, ওই পত্রের শেষাংশে রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুরপ্রমুখ দেশী রাজনীতিকরা বর্ণিত হয়েছেন কলুর বলদ রূপে; আর বঙ্কিমনির্দিষ্ট আদর্শ রাজনীতিক বর্ণিত হয়েছে উদ্যতশৃঙ্গ বলিষ্ঠ বৃষ রূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার একটি বাক্য এই—

"ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।" তার পরে আছে, বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ দেখে দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে কলুপত্নী যখন এই দস্যুতার প্রতিবিধান করার অভিপ্রায়ে একটি বংশদণ্ড নিয়ে এগিয়ে এল তখন বৃষ তার ভীষণ শিং বাঁকিয়ে তাকেই তাড়া করল। তাড়া খেয়ে কলুপত্নী রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল। আর বৃষ তখন পরম নিশ্চিন্ত মনে অভীষ্ট সিদ্ধ করল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস এই বৃষনীতিই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের অভিপ্রেত রাজনীতি। আর এটাই যে ছিল বঙ্কিম-স্বীকৃত রাজনীতি তাতেও সন্দেহ নেই। যা হক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৃষবলদ-কাহিনীতে যে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বোদ্ধৃত কবিতাংশের ছায়াপাত ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। খোলবিচালিপূর্ণ গামলা ও শিং বাঁকানোর বর্ণনাই তার নিঃসংশয় প্রমাণ।

এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে স্বীকার করতে হবে, ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি তাঁর স্বকালকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমরচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' এবং কমলা-কান্তের উক্ত দ্বিতীয় পত্রখানি গ্রন্থভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় একই বৎসরে (বাং ১২৯২ । ইং ১৮৮৫-৮৬)। সুতরাং তৎকালেও যে ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত 'শিং বাঁকানো' রাজনীতি অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে স্বীকৃত এবং 'পোষা গরু'র রাজনীতি ধিকৃকৃত হচ্ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ঈশ্বর গুপ্তের এই একটিমাত্র উক্তিকে আশ্রয় করে এমন ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। বস্তুতঃ ওজাতীয় আরও অনেক উক্তিই বিকীর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। তাঁর রচনার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই এ কথা জানেন। বঙ্কিমচন্দ্রও জানতেন। তাই তিনি ওরকম একটি সাধারণ মন্তব্য করতে প্রণোদিত হয়েছিলেন এবং তার সমর্থনে 'অনেক কথা' বলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছিলেন।

যা হক, 'পোষা গরু'র রাজনীতি অর্থাৎ আবেদন আর নিবেদনের থালা-বওয়া নতশির রাজনীতি যে আরও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বহু মনীষীর ধিক্‌কার লাভ করেছিল, তা এত সুবিদিত যে তার উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট। এই দুর্বলের রাজনীতির নামান্তর ভিক্ষাবৃত্তি। তার বদলে সবলের রাজনীতি অর্থাৎ আত্মশক্তির চর্চা তথা শিং বাঁকানোই যে এক সময়ে জাতীয় কাম্যবস্তু হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে ১৯০৫ সালের বঙ্গবিপ্লবের ইতিহাসে ও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে। এই আত্মশক্তিবাণীর অন্যতম ক্ষীণ উৎসধারা দুর্লক্ষ্য হয়ে বিরাজ করছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলীর অনতিস্ফুট ঊষাকালের প্রায়ান্ধকার গহনভূমিতে।

ঈশ্বর গুপ্তকে ঠিকমতো জানা চাই। নতুবা বাঙালিকে বা বাংলা সাহিত্যকে ঠিকমতো জানা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই আমরা তাঁকে প্রাচীন যুগের শেষ কবি বলে ভাবতে শিখেছি। ইংরেজি-জানা ও ইংরেজি-না-জানা কবিদের আমরা মনে মনে দুটি স্বতন্ত্র জাতে বিভক্ত করে থাকি এবং তদনুসারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকেও দুটি স্বতন্ত্র যুগে খণ্ডিত করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই বাংলা সাহিত্যের অচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আমাদের চোখে পড়ে না। ইংরেজি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের মোহদৃষ্টি আছে। কারণ, "বাল্যকাল থেকেই আমরা ইংরেজের ছাত্র। অভিভূত মন নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যের বিচার চলে না।" এই মোহদৃষ্টি ঘুচলে দেখতে পাব আধুনিকতার অনেকগুলি উৎসধারাই নিঃসৃত হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী থেকে। সে ধারাগুলি ক্ষীণ ছিল সন্দেহ নেই এবং ইংরেজি-জানা কবিরা সে ধারাগুলিকে প্রবল প্রবাহে পরিণত করেন এ কথাও সত্য। কিন্তু এই দুএর মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা করলে সত্যকেও খণ্ডিত করা হয় এবং নিজের যথার্থ ঐতিহ্যকেও খর্ব করা হয়।

আজকাল কেউ কেউ ঈশ্বর গুপ্তকে একই সঙ্গে পূর্বযুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তাঁরা বর্তমান যুগটাকে দ্বিখণ্ডিত না করে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনসাধনাকেই দ্বিখণ্ডিত করেন। কিন্তু এরকম দু-মুখো সাধনা মোটেই সম্ভব কি না সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। আসল সত্য এই যে ঈশ্বর গুপ্ত সেই যুগসন্ধির কবি যখন প্রাচীনের শেষ প্রভাবটুকু ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এবং আধুনিকতার প্রভাতরশ্মি ক্রমবর্ধমান তেজে বাংলার আকাশকে উদ্ভাসিত করে তুলছিল। তাঁর প্রায় ত্রিশবৎসর-ব্যাপী সাহিত্য-জীবনের (১৮৩০-৫৯) বিবর্তন-ধারা অনুসরণ করা যদি সম্ভব

হয় তবে দেখা যাবে, তিনি স্বকালের সঙ্গে তাল রক্ষা করেই চলেছিলেন এবং আধুনিক বাংলার নিষ্প্রভ প্রত্যুষকালে যাত্রারম্ভ করে প্রখর মধ্যাহ্নের কাছে এসে পৌঁচেছিলেন। এ ভাবে দেখলে শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে নয়, বাংলার সাহিত্য-সাধনাকেই সত্যরূপে দেখা হবে। কেননা, তৎকালে তিনিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রতিভূ। তাঁর কাব্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শৈশবসংগীত ধ্বনিত হয়েছিল।

২

এবার ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বতন যুগের গীতিকবিতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়াস করি।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগে রচিত গীতিরচনাকে 'লিরিক' বলা উচিত কি না, এই কূটতর্ক নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

> "ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক।"
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' : প্রথম খণ্ড, গীতিকাব্য

তাই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীকে একই লিরিক বা গীতিকাব্য পর্যায়ে ফেলেছেন। গীতিকবিতার প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

> "রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালা'র প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক-একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।"
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' : প্রথম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব

জয়দেবপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের গীতিরচনাগুলি সবই ভক্তির বেনামীতে প্রেম-সংগীত এবং তাতে নিজেদের বিরহমিলনের আনন্দবেদনার কথা বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে। কিন্তু রামপ্রসাদাদি কবি ও কবিওয়ালাদের রচনায়

প্রেম দেখা দিয়েছে প্রেমরূপেই, তাকে ভক্তির ছদ্মবেশ পরানো হয় নি, ভক্তিও প্রকাশ পেয়েছে আপন মহিমায়। তা ছাড়া হৃদয়ানুভূতির আরও নানা সুর বেজে উঠেছে তখনকার দিনের গীতিরচনায়। তখন যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা রচিত হত না তা নয়, কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে কবির নিজের এবং সমস্ত মানুষের আনন্দ-বেদনার সুরও ধ্বনিত হয়েছে নানা রচনায়। এই হৃদয়গত আনন্দবেদনার উচ্ছ্বাসের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক লিরিকজাতীয় গীতিকবিতার বিশিষ্টতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁদের কয়েকজনের রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করি—

মনে রইল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি-বলি বলা হল না—
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

...

যখন হাসি হাসি, সে, আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে, ছি ছি ধোরো না॥

—রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই— তোমা বই আর জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেজন্য দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে॥

—শ্রীধর কথক (১৮১৬—?)

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি বলি তোমাকে।
শুনেছ কখনো জলন্ত আগুনো
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে॥

—হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৪)

দাসী ব'লে অভাগীরে
আজও কি তার মনে আছে ?…
বাসে না বাসে না ভালো,
সে ভালো থাকিলে ভালো,
দেখা হলে সুধাস লো,
সে তো আমার ভালো আছে ?
—রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)

সবগুলি দৃষ্টান্তই প্রেমসংগীত। বলা যেতে পারে রামনিধি গুপ্তই বাংলায় প্রেম-সংগীত রচনার প্রবর্তক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনিই রাধাকৃষ্ণলীলার ছদ্মবেশ না পরিয়ে সাধারণ নরনারীর মিলনবিরহের বিচিত্র হৃদয়ভাব অবলম্বনে যথার্থ গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর রচনায় যে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে ও মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি যেভাবে ধরা পড়েছে তাতে আধুনিক পাঠকের চিত্তও মুগ্ধ হয়। তাঁর কণ্ঠ থেকে প্রণয়সংগীতের যে ধারা নিঃসৃত হল, তাই দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। কোথাও ছেদ পড়ে নি। তাঁর পরবর্তী হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রেমবিষয়ক রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা যে একই পর্যায়ভুক্ত, এ দুএর মধ্যে যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই, তা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

রামনিধি প্রেম ছাড়া অন্য বিষয়েও গান রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর—

নানান দেশের নানান ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর ?
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?

এই বিখ্যাত গানটির কথা বলা যেতে পারে। রামনিধির এই উক্তি এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'মাতৃসম মাতৃভাষা', রবীন্দ্রনাথের 'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত', দ্বিজেন্দ্রলালের 'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান' এবং অতুলপ্রসাদের 'আ মরি বাংলা ভাষা' ইত্যাদি রচনা যে একই ভাবধারার অন্তর্গত তাও বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার ধর্মবিষয়ক গীতিরচনার কথা উল্লেখ করি। এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদের (১৭২০-৮১) নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর ধর্মসংগীতগুলি একান্তভাবেই আত্মগত।

তাঁর সুগভীর ভক্তি ও আন্তরিক আত্মনিবেদনের সুর এই গীতিরচনাগুলিকে উচ্চাঙ্গের লিরিকের স্তরে উন্নীত করেছে। এই ভক্তি ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে নিজের দুঃখবেদনা ও অভিমানের রঙ মিশ্রিত হয়ে এই গীতিরচনাগুলিকে অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ আমাদের নেই। তাই নমুনা হিসাবে কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

১ মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ, এলোকেশী ?
না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষে মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না॥

২ আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
তবে দেও দুঃখ মা, আর কত তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোনো খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা, বাজার মিলাই॥
..
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নামাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥

৩ করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, গো তারা,
আমার এমন দশা, শাকে অন্ন মেলে কই ?
কারে দিলে ধন-জন মা, হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেহ নই ?
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি
শ্যামা হলে পাষাণময়ী॥

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না?
কোন্ প্রাণে তার মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা॥

এগুলির সুর কবির নিজের সুর। এর মধ্যে যে আত্মনিবেদনের আন্তরিকতা ও গভীর ধর্মানুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে তাতেই নিহিত রয়েছে যথার্থ গীতি-কবিতা অর্থাৎ লিরিকের মর্মবাণী।

এ প্রসঙ্গে বাউল-পদাবলীর কথাও কিছু বলা দরকার। এজাতীয় গীতিকবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।"

—মহম্মদ মনসুর-উদ্দীন, 'হারামণি' : প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ ২

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বাউলগানকে অতি উচ্চস্তরের গীতিকবিতা বলে মনে করতেন। তাঁর নিজের রচনাতেও তার প্রভাব আছে বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।" বস্তুতঃ রবীন্দ্ররচনাতে বাউলবাণীর ছাপ আবিষ্কার করা খুব দুঃসাধ্য কাজ নয়। বাউলগীতির প্রতি তাঁর এই অনুরাগের নিদর্শন তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-নামক সংকলন-গ্রন্থখানিতেও (১৯৩৯) পাওয়া যায়। যা হক, বাউল-গীতিকবিতার কয়েকটি অংশ তুলে দিলেই তার কাব্যগত উৎকর্ষের পেমাণ পাওয়া যাবে।

শেখ মদন বাউলের একটি গান এই—

যদি করিস মানা, ওগো বন্ধু,
মানি এমন সাধ্য নাই।
কোনো ফুলের নামাজ রং বাহারে,
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে,
বীণার নামাজ তারে তারে,
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই॥

এই ভাবটিই রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নাটিকার (১৯২৬) মর্মকথা। নটী তার নৃত্যকেই পূজারূপে নিবেদন করেছিল তার অন্তরের ইষ্টদেবতার কাছে। এটির মর্মবাণী তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন তার 'আমার ধর্ম'-নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ রূপে।

মদন বাউলের আর-একটি গান—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই,
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥
...
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান তালা—
পুরাণ-কোরান তবসী-মালা;
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা—
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে॥

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের—

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার;
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥

তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' ইত্যাদি রচনাটিও স্বভাবতঃই মনে আসে। আর, 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো-সংখ্যক ('ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' ইত্যাদি) কবিতাটিতে রবীন্দ্রজীবনে এই বাউলবাণীর প্রভাবের কথা বিধৃত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় ভাষায়।

গঙ্গারাম বাউলের একটি গানের প্রথমাংশ এই—

পরান আমার সোঁতের দীয়া।
আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে ?
আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা,
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা গা !
তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা ॥
অচিন ফুলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা—
'কূলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা'।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি, চলে যে ধারা ॥

অজ্ঞানের অভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত কালস্রোতে ভাসমান ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলমান জীবনপ্রদীপের এমন বর্ণনা যে-কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ।

ঈশান যুগীর কণ্ঠে বেজেছে জীবনসংগীতের আর-এক স্বর—

ধন্য আমি, বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাই রে কোনো দুখ ॥
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশি, আমি তোমার ফুঁক।
ভালোমন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি সুখ আর দুখ ॥
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি, বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি, তোমার মনের সাথ ॥
একবারেতে ফুরাই যদি কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা, আর কি আমি চাই ॥

বিশ্ববীণায় ঝংকৃত জীবনসংগীতের এমন বর্ণনাও দুর্লভ। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই ভাবের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে নানা স্থানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর—

বাজাও, আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও ॥

ইত্যাদি গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এবার বিশা ভুঁইমালী—

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।

ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর, পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই—
হে বন্ধু, মুক্তি কোথাও নাই।
তুমি পার যদি যাও না ছেড়ে, ছাড়বে কি করি ॥

এর প্রথম অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে।

—'বলাকা', ৩৩

এই উক্তির ভাবগত মিল দেখা যায়। আর উক্ত বাউল-গীতটির শেষাংশ তো অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় গীতাঞ্জলির এই উক্তিটি—

মুক্তি ? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।

দেখা গেল বাউলগীতি ও রবীন্দ্রগীতি এক সূত্রেই বাঁধা। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো ভেদ নেই। বাউলবাণীতে যে জীবনসত্য ও জীবনানুভূতি অপূর্ব কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত হয়ে সুরমূর্ছনায় বিকশিত হয়েছে তার অসামান্যতা না মেনে উপায় নেই।

পূর্ব বাংলার কোনো অজ্ঞাতনামা বাউল কবির একটি গানও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বাউল-গানের ভাণ্ডারী ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় (১৮৮০-১৯৬০) কুমিল্লার সুগায়ক শ্রীপরিমল দত্তকে[১] এই গানটি শিখিয়েছিলেন। আমি পরিমল বাবুর কণ্ঠেই এ গান শুনেছি বহুকাল পূর্বে, আর তখনই তাঁকে দিয়ে এটি লিখিয়ে রেখেছিলাম। গানটি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। তাই এটি নিম্নে সমগ্রভাবেই উদ্ধৃত করা গেল।—

প্রেমের মোল[২] প্রেমই রে বান্ধা,
না রে সুখ, না রে দুখ।

---

১ পরিমল দত্ত— কুমিল্লা অভয়-আশ্রমের সর্বত্যাগী আজীবন কর্মী।
২ মোল— মূল্য।

ও তুই প্রেমের রসিক যদি রে বান্দা,
তবে তো প্রেম পিয়াস, প্রেম ভুখ ॥
আগুনেতে জলে রে আগুন,
সে আগুন কোন্‌খানে,
ওরে তোরই মাঝে আছে রে আগুন,
জলে তুখের ঘষানে রে বান্দা,
জলে তুখের ঘষানে।
সেই লুকানো আগুন আরে বান্দা,
বাহির যদি হয়,
তবে কই বা ভিতর, কই বা বাহির,
সকল বেড়া ভস্মময় রে বান্দা,
বেড়া ভস্মময়।
ও তোর সুখে তুখে জলুক রে আগুন,
ও তোর পরাণ ফাইটা আঁধার কাইটা
বাইরক[১] রে আগুন।
ও তুই প্রেমের রসিক যদি রে বান্দা,
তবে তুঃখে ডর তোর কি রে বান্দা,
তুঃখে ডর তোর কি ?[২]

গানটির ভাবগত সৌন্দর্য ও গভীরতা অনুভূতিগম্য, তাই ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, অনুরূপ বা প্রায়-অনুরূপ ভাবনা ও প্রতীক প্রয়োগ রবীন্দ্ররচনায় তুর্লভ নয়। এখানে এই গানের শুধু প্রথম উক্তিটির সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত তুটি রবীন্দ্রোক্তির তুলনা করাই বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম উক্তিটি রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রায় পূর্ণ যৌবনকালে।—

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইতো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।

১ বাইরক—বাহির হউক।

২ মনে হয় গানটি অপূর্ণ। তার কারণ সম্ভবতঃ গায়কের স্মৃতিচ্যুতি।

এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

—মানসী, পূর্বকালে (২ ভাদ্র। ১৮৮৯)

দ্বিতীয় উক্তিটি রচিত তাঁর জীবনের সায়াহ্নবেলায়। এটিও প্রেম পর্যায়ের রচনা। এর শেষাংশে আছে তাঁর বিলীয়মান জীবনের এই চরম অনুভূতির কথা—

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী-'পরে,...
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা।

—গীতবিতান, 'দিনান্তবেলায়'

আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যই আধুনিক বাংলা কবিতার আসল প্রেরণাস্থল এবং বিহারীলালের পূর্বে বাংলা গীতিকবিতায় কবির নিজের সুর শোনা যায় নি কিংবা লিরিকধর্মী আত্মনিবেদনের সর্বজনীন বাণী উচ্চারিত হয় নি, এ কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নিলে সত্য ও বাংলা সাহিত্যের সুচিরাগত ঐতিহ্য, উভয়কেই খর্ব করা হয়। আসল সত্য এই যে, গীতিকবিতার ধারা চিরকাল ধরেই বাঙালির জাতীয় মর্মকেন্দ্র থেকে নিঃসৃত হয়ে শোণিতপ্রবাহের মতো তার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। আশ্চর্যের বিষয়, এ ক্ষেত্রে তার সমাজজীবনে উঁচুনিচু স্তর বা জাতিভেদ স্বীকৃত হয় নি। প্রাচীন কালের লুইপাদ ও জয়দেব থেকে আধুনিক কালের ঈশান যুগী, বিশা ভুঁইমালী, মদন শেখ ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে সমাসীন।

গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে কবি য়েট্‌স্ এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—

"আপনার এই যে কাব্য আজ আমাদের গোচর হল, একে বাংলা সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি, কিন্তু বস্তুত এ তো বিচ্ছিন্ন নয়; যে একটি বৃহৎ ভূমিকার উপর এই কাব্যের বিশেষ স্থান আছে সেটি না জানতে পারলে এর রস উপলব্ধি হয় তো সম্পূর্ণ হবে না।"

—ললিতমোহন ও চারুচন্দ্র -সম্পাদিত 'বঙ্গবীণা', (১৯৩৪), পরিচয়

য়েট্‌সের এ কথা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল এবং তাতে তাঁর অন্তরের সায়ও ছিল। ছিল বলেই দীর্ঘকাল পরে বাংলা কাব্যধারার পরিচয়

দিতে গিয়ে তিনি প্রথমেই আন্তরিক অনুমোদনসহ য়েট্‌সের এই উক্তিটি স্মরণ করেন।

শুধু গীতাঞ্জলি নয়, কোনো আধুনিক বাংলা গীতিকবিতাই প্রাচীন গীতিকবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিছিন্ন করে দেখলে সত্য করে দেখা হবে না। আসলে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারা বাঙালির মর্মজাত ভাবধারার সঙ্গে অভিন্ন, তার উৎস নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতে তার ঐতিহ্যের নিভৃত কন্দরে। পশ্চিম থেকে নূতন স্রোত এসে তার ধারায় প্রবলতা ও নবীনতা সঞ্চার করেছে, কিন্তু তার উৎসই পশ্চিমদেশে এ কথা বললে শুধু স্বদেশকে নয়, ইতিহাসকেও অবজ্ঞা করা হবে।

আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার প্রাণবস্তু এক। কিন্তু একটু পার্থক্যও আছে; সে পার্থক্য বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গে নয়। প্রাচীন গীতিকবিতার ভাষা অপ্রসাধিত, মণ্ডনকলার আভিজাত্যও তার নেই। আধুনিক গীতিকবিতার মার্জিত ভাষার ঔজ্জ্বল্য ও সযত্ননিবদ্ধ ভূষণবাহুল্যের আভিজাত্য স্বভাবতঃই চিত্তবিভ্রম ঘটায়। বিশেষতঃ কোনো কোনো ভূষণ যখন বহুমূল্য দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা হল তখন ভূষণপরিহিতাকে বিদেশিনী বলে ভ্রম জন্মাতে না পারলে তো তার আভিজাত্যই ক্ষুণ্ণ হয়। রিক্তভূষণা বল্কলবসনা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রাসাদবাসিনী সুকৃতবেশা রত্নভূষণা শকুন্তলাকে অভিন্ন বলে চিনতে পারলে তো রাজরানীর গৌরবহানিই ঘটে, আর অভিন্ন বলে চিনতে না পারলে সাধারণ দর্শককেও দোষ দেওয়া যায় না। আধুনিক কালে আভিজাত্যগর্বিতা বাংলা গীতিকবিতারও সেই দশাই হয়েছে।

৬

লিরিক কবিতার রস নিত্যকালীন ও সর্বজনীন, কোনো বিশেষ কাল বা জনসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। তাই অজ্ঞাত-অখ্যাত লোকসাহিত্যেও এই রসের সন্ধান মিলতে পারে। কারণ আনন্দবেদনার হৃদয়রস অখ্যাত লোককবির রচনাতেও উচ্ছলিত হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিমার্জিত অলংকরণ তথা সংরক্ষণপ্রয়াসের অভাবে এসব লিরিকজাতীয় লোকগীতি কালের বুকে উত্থিত হয়েই বিলীন হয়ে যায়। তবু খননলব্ধ লুপ্ত প্রত্নরত্নের মতোই এসব লৌকিক গীতিকবিতার দু-একটি টুকরো প্রতিভাবানের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে রক্ষা পেয়ে গেছে। এখানে তারই একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একদা প্রদোষকালে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গাবক্ষে 'কাব্যের রাজ্য' উপস্থিত হল ; অথচ মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্য পড়েও মনের তৃপ্তি হল না, এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র শুনতে পেলেন গঙ্গায় জাল বাইতে বাইতে জেলের কণ্ঠের সুমধুর গান—

"সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল— বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম।"

—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১২৯২), উপক্রমণিকা

এক কথায়, এই গানটিতে বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি লিরিক সুরের সন্ধান পেলেন যা তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সাধুসাহিত্যেও সুলভ ছিল না। বোঝা গেল, অবজ্ঞাত লোকসাহিত্যেও এমন সর্বজনীন গীতিরস থাকতে পারে যা আধুনিক শিক্ষিত ও মার্জিত মনের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ।

আর-এক দিন শ্রাবণের শেষে সূর্যাস্তবেলায় জলপ্লাবিত পল্লীবাংলার বুকে নৌকাভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন দশবারোজন লোক একসঙ্গে গান গাইতে গাইতে একটি ডিঙি বেয়ে চলেছে। গানের ধুয়োটি এই—

যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা খ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি॥

"গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়ালঘরের পাশে, এই কুলগাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিলকটাক্ষপাতে গ্রাম্যকবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।"

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য (১৩০৫)

বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে গানের এই দুটি পঙ্‌ক্তিতে যে সুর বেজে উঠেছে তাতে পল্লীজীবনের উপযোগী সর্বজনীন লিরিক রসের অভাব ঘটে নি

সর্বশেষে বাংলা লোকসাহিত্যের আর-একটি বিভাগের কথা উল্লেখ করা উচিত। সে বিভাগের পরিচয় পাই ময়মনসিংহগীতিকায়। এই কবিতাগুলি ঠিক লিরিক বা গীতিকবিতা -জাতীয় নয়, এগুলি হচ্ছে বস্তুতঃ কাহিনীকবিতা। কিন্তু এই কাহিনীগুলিতে মাঝে মাঝে যে লিরিকস্থলভ হৃদয়োচ্ছ্বাস কল্লোলিত হয়ে উঠেছে তাতে এগুলি স্থানে স্থানে গীতিকবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই হৃদয়লীলার রঙিন আভায় রঞ্জিত হয়ে এই কাহিনীগুলি চিরন্তন সৌন্দর্য-লোকে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এই সৌন্দর্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সম্পূর্ণতার খাতিরে চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দের কাহিনী থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করি—

শিশুকালের সঙ্গী তুমি,
যৌবনকালের মালা ;
তোমারে দেখিতে, কন্যা,
মন হইল উতলা।
ভাল নাহি বাস, কন্যা,
এই পাপিষ্ঠ জনে ;
জন্মের মত হইলাম বিদায়
ধরিয়া চরণে ॥

'ময়মনসিংহগীতিকা' গ্রন্থের গাথাকবিতাগুলির রচয়িতাদের সম্বন্ধে বিচক্ষণ সমালোচক বলেছেন—

> "তাঁহারা কোমলকান্ত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গদেশকে সমৃদ্ধ ও চিরঋণী করিয়া গিয়াছেন।"

অতঃপর এই গাথাগুলির মূল্যনিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন—

> "ইহাদের প্রধান মূল্য খাঁটি কবিত্বরসে ; মানবমনের স্থখদুঃখ, প্রেমবিরহ সম্বন্ধে প্রাণের দরদে ; সমাজ ও সংস্কার অপেক্ষা মানুষ যে বড়, সেই অতি আধুনিক কথাটিকে জোর করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিবার মতন সাহস ও শক্তিতে।...জীবনের ট্র্যাজেডি এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, এগুলি অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক ছোটগল্পের সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছে।"

— ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গবীণা' (১৯৩৪), পৃ ৪৬২-৬৩

এই গাথাকবিতাগুলি কবে রচিত হয়েছিল জানি নে, আধুনিক কালে যে নয় তা সুনিশ্চিত। তথাপি এগুলিতে এই অতি আধুনিক জীবনমূল্যবোধের এমন আশ্চর্য উচ্ছ্বাস দেখা দিল কেমন করে? আসল কথা এই যে, যথার্থ জীবন-মূল্যবোধ কোনো বিশেষ কালের সম্পত্তি নয়। সত্যবস্তু সব কালেরই আধুনিক। শুধু আধুনিকতার রাঙ্‌তা-মোড়া তকমা নিয়ে কোনো সাহিত্যই চিরন্তন বাণীমন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না। ময়মনসিংহের গাথাগুলি সৌন্দর্যসত্যের জয়তিলক ললাটে নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল, চিরন্তন মর্যাদার সনদ ছিল তাদের দখলে। তাই তারা তখনকার দিনেও আধুনিকতার মর্যাদা পেয়েছিল, এখনও পায়। সব সত্যের ন্যায় সৌন্দর্যসত্যও যুগে যুগে দেহান্তর পরিগ্রহ করে, তাদের রূপান্তর ঘটে; কিন্তু তার আত্মার পরিবর্তন হয় না, কেননা, আত্মা অবিনশ্বর। উক্ত গাথাকবিতাগুলি জন্মান্তর গ্রহণ করে বর্তমান কালে অংশতঃ গীতিকবিতায় ও অংশতঃ ছোটগল্পে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মা রয়েছে অপরিবর্তিত।

১৮৫৯-৬০ সালে বাংলা সাহিত্যে এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভ হল, এ ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, আশা করি এ কথা এখন স্পষ্ট করতে পেরেছি। সেই যুগসন্ধিকালে বাংলা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করে নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু তার জীবনধারা ছিল অবিচ্ছিন্ন। তার দেহেরই রূপান্তর ঘটেছিল, আত্মার নয়। কিশোর বালক যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন তার দেহে মনে নবীনতার আবিভাব ঘটে, তার জীবনপ্রবাহে ছেদ ঘটে না।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো।

কবি রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র

অনেকেরই ধারণা আছে যে, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) ছিলেন অনেকাংশেই ভারতচন্দ্রের (১৭০৬-৬০) অনুবর্তী। সম্ভবতঃ তার মূল কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' পুস্তকের (১২৯২ আশ্বিন ১৫) ভূমিকায় তাঁর জীবনচরিত ও কবিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"ভারতচন্দ্রী ধরনটা তাঁহার অনেক ছিল বটে,— অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরন ছিল যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে।"

অতঃপর বসুমতী সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর 'মুখবন্ধে' (১৩০৬ আশ্বিন ১৫) সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন লেখেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-ভঙ্গিমায়, শব্দপ্রয়োগে, অলংকারবিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি পদলালিত্য, তেমনি রসপ্রাচুর্য, তেমনি শব্দাড়ম্বর। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও দোষ হয় না।"

তার অনেক কাল পরে 'কাব্যবিতান' গ্রন্থের (১৩৬৩ চৈত্র) ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী 'নব্যযুগের প্রথম কবি' ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন—

"তাঁহার কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তখন না ছিল ভারতের যুগ, তাঁহার না ছিল ভারতের প্রতিভা।"

ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং কি পরিমাণে ভারতচন্দ্রের শিল্পাদর্শের অনুসরণ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ও বিচার-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে তা আবশ্যক নয়।

ব্যাপক আলোচনার অভাব থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্রের শিল্পাদর্শে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় রামপ্রসাদের (১৭২০-৮১) প্রভাব সম্বন্ধে সে চেতনারও পরিচয় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা আমার চোখে পড়ে নি। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক ক্ষেত্রেই

রামপ্রসাদের অনুবর্তী ছিলেন তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বর্তমান আলোচনার অভিপ্রায়।

এই আলোচনায় প্রধানতঃ যেসব গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেছি, মূল বিষয় অবতারণার পূর্বে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।—

রামপ্রসাদ

১। মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত (১২৬০ পৌষ, মাঘ ও চৈত্র) ঈশ্বরচন্দ্রকৃত রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা-সংকলন। ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -রচিত কবিজীবনী' গ্রন্থে (১৩৬৫ আশ্বিন) পুনঃ-প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬৪। এই গ্রন্থখানি বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

২। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ষষ্ঠ সংস্করণ। তারিখ নেই। পৃ ৬১+৬৬।

৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -রচিত 'সাধককবি রামপ্রসাদ' (সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-সম্বলিত), ১৯৫৪।

ঈশ্বরচন্দ্র

১। বঙ্কিমচন্দ্র -সম্পাদিত 'কবিতাসংগ্রহ। সংবাদ-প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -প্রণীত কবিতাবলী।' প্রকাশ ১২৯২ আশ্বিন ১৫। —পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪৮। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' -বিষয়ক প্রবন্ধটির (৮০ পৃষ্ঠা) মূল্যবত্তা সুবিদিত। এই গ্রন্থে ধৃত পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য রচনা সংকলনের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই 'কবিতাসংগ্রহ' গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

২। কিছুকাল পূর্বে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' -শীর্ষক বঙ্কিম-রচিত ভূমিকাটি অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের সম্পাদনায় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৫ ভাদ্র)। এই গ্রন্থের ভূমিকা এবং 'আনুষঙ্গিক তথ্য' -শীর্ষক সুবিস্তৃত ভাষ্যাংশটি (পৃ ৪৯-৩৩৯) অতিশয় মূল্যবান্। বর্তমান আলোচনায় প্রয়োজন মতো এই গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -প্রণীত 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক। প্রথম ভাগ (প্রথম

তিন অঙ্ক)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪০। কবির অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত -কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নি।

৪। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত -সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড (১৩০৮)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৭৬।

এই গ্রন্থে ষড়ঙ্ক 'বোধেন্দুবিকাস' নাটকটি সমগ্রভাবেই প্রকাশিত হয়েছে (পৃ ১-২৭৪)। তা ছাড়া অনেকগুলি কবিতাও এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে (পৃ ২৭৫-৩৭৬)।

৫। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন -সম্পাদিত 'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' (বসুমতী)। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭০। প্রকাশ ১৩০৬। 'মুখবন্ধে'র তারিখ '১৫ই আশ্বিন ১৩০৬ সাল'।

এই গ্রন্থাবলীর অন্য একটি সংস্করণও আমি দেখেছি। এটিতে মুখবন্ধের তারিখ আছে '১৫ই আশ্বিন ১৩০৮'। ১৩১৪ সালে পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন -কৃত মুখবন্ধের বক্তব্য একই আছে, তবে তাঁর ভাষায় কিছুকিছু সংস্কার করা হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬২। এই সংস্করণের 'বিবিধ' বিভাগে পূর্ববর্তী সংস্করণের কতকগুলি কবিতা বর্জিত ও তার স্থলে কতকগুলি নূতন কবিতা সংকলিত হয়েছে। মুখবন্ধে এই গ্রহণ-বর্জনের কোনো হেতু নির্দেশ করা হয় নি।

৬। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)। সম্পাদকের নাম ও তারিখ নেই। এটিতে সংকলিত রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বর্তমান আলোচনায় এই গ্রন্থাবলীর পাঠই অনুসৃত হয়েছে।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, উভয়ের রচনাসংগ্রহগুলিতেই কিছু কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। রামপ্রসাদের রচনার পাঠভেদ অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র -সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহে'র পাঠ নিঃসন্দেহে পরবর্তী সংগ্রহের পাঠের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র -ধৃত ও সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনার পাঠ নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। সে পাঠে অনেক স্থলেই অর্থ হয় না। তা ছাড়া এমন ছন্দোদোষও আছে যা রামপ্রসাদের রচনার পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে করা যায় না। রামপ্রসাদী রচনার অন্যান্য সংকলনেও অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। সব পাঠ মিলিয়ে যথার্থ পাঠ নির্ণয় করা প্রচুর শ্রমসাধ্য ও গবেষণাসাপেক্ষ হলেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে

তা একটি অবশ্যকরণীয় কাজ। যা হক, বর্তমান প্রবন্ধে আমাকে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে পাঠ নির্বাচন করে নিতে হয়েছে। যেসব পাঠ বিতর্কের বিষয় বলে বোধ হয়েছে সেগুলি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ অংশই উদ্ধৃত করেছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের কোনো কোনো রচনার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন—

এক। কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা তো কেহ নয়, মা গো।

—'কবিতাসংগ্রহ', নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃ ১১৫। গ্রন্থাবলী, পৃ ৩৯

এই ছত্র-দুটি অনিবার্য-রূপেই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোক্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো ত।

—মা আমায় ঘুরাবে কত

দুই। ভিটে গেল যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে ঘাটে।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত, পৃ ১৬৩

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥

আর-একটি গানেরও প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি ঠিক এ-রকম। কেবল 'তারা'র

১ ১৩০৮ সালের সংস্করণে এই রচনাটির নাম ছিল 'পৌষপার্বণ গীতি'। ১৩০৬ সালের সংস্করণে এটি ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র -সম্পাদিত 'কবিতাসংগ্রহে'ও না।

স্থলে আছে 'আমি'। দ্রষ্টব্য যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত -প্রণীত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৯৫৪) সংকলিত পদাবলী, ১৫১-৫২। বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে দুটি গানেই (১২৯-৩০) আছে 'আমি' অথচ সূচীপত্রে দুই স্থলেই আছে 'তারা'।

তিন। মহামায়া, কেন তুমি এত মায়া ধর ?
বাজীকরের মেয়ের মত,
বাজী কেন কর ?

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), ৩য় অঙ্ক, পৃ ১২২

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥

—মন গরিবের কি দোষ আছে

চার। সর্বঘটে বিরাজ করে,
যারে বলে সর্বগত।
মন শুদ্ধ মনে শুদ্ধ রে তার
হোয়ে থাকো অনুগত॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃ ২৩২

এই উক্তিটি রামপ্রসাদী বাণীরই প্রতিধ্বনি মাত্র। রামপ্রসাদের বাণী এই—

শ্রীরামপ্রসাদ রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধআঁখি দেখ কাকে
তিমিরে তিমির-হরা।

—এমন দিন কি হবে তারা

উদ্‌ধৃত চারটি গানের একটিও সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনা সংকলনে ধরা হয় নি। এবার এমন একটি গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যা ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনেও পাওয়া যায়।

পাঁচ। যতন্ করে রতন্ পেলেম্,
মতন্ মতন্ বাছে বাছে।

আমি কাঁচা সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে ॥

— 'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ ২৭১

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত কথাগুলির ছায়াপাত ঘটেছে—

প্রসাদের মন্ হও যদি মন্,
কর্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন্ মতন্, কর যতন্
রতন্ পাবে অতি খাসা ॥

—মন কর্মো না সুখের আশা, 'কবিজীবনী', পৃ ৫৩

এখানে ভাষাগত সাদৃশ্যই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। উল্লেখ করা উচিত যে, 'মতন্ মতন্' পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রেরই। অন্যান্য সংকলনে আছে 'মনের মতন'।

এই দৃষ্টান্তগুলি সবই রামপ্রসাদের সাধন-সংগীত থেকে সংকলিত। ভালো করে সন্ধান করলে এ-রকম আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে আশা করি। রামপ্রসাদের সমরসংগীত থেকেও এ-রকম ছায়াপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক তৃতীয় অঙ্কের 'কে রে বামা বারিদবরণী' এবং 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি দুটি গানেই অনেকগুলি রামপ্রসাদী গানের ভাব ও ভাষার যুগপৎ সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ছন্দ-আলোচনার প্রসঙ্গে তা দেখানো যাবে। তবু নমুনা হিসাবে এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

'কে রে বামা বারিদবরণী' ইত্যাদি প্রথম গানটিতে আছে—

হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ
চরণ শরণ লয়।

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোদ্ধৃত দুটি উক্তির আভাস পাওয়া যায়।

১ মরি কিবা অপরূপ,
নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।

১ মোহিনী ভালে বালশশী, 'কবিজীবনী', পৃ ৭২

২ মরি হে কিরূপ,
দেখ দেখ ভূপ,
রসসুধাকূপ
বদনখানি।

—ও কে রে মনোমোহিনী, 'কবিজীবনী', পৃ ৯৩

'বোধেন্দুবিকাসে'র পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গানটির প্রথমেই আছে—

কে রে বামা ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী এ যে, নহে মানুষী,
'ভালে শিশুশশী', করে শোভে অসি,
'রূপ মসী', চারু ভাস।

এটিতে রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত দুটি গানের ছায়াপাত লক্ষণীয়।

১ নীলকমলদলজিতাস্য,
তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য,
'ভালে শিশুশশী'।

—শ্যামা বামা গুণধামা, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০

২ শবশিশু ইষু শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা 'রূপ মসী'॥

—এলো চিকুর নিকর, নরকর কটি তটে

এই শেষ গানটি ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনে নেই।

ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তায় ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষার এ-রকম বা এতখানি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বা ছায়াপাত ঘটেছে কিনা তা বিচার করে দেখি নি। দেখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

শুধু ভাব ও ভাষা নয়, রামপ্রসাদী সুরের বিশিষ্টতাও ঈশ্বরচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রমাণ এই যে, তিনি অন্ততঃ পাঁচটি গান রামপ্রসাদী গানের ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি যে রামপ্রসাদী সুরে গেয় এমন স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন ওই গানগুলির উপরে। যথা—

১ সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে

—'কবিতাসংগ্রহ', নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃ ১১৪

২ অহংকারে অন্ধ হয়ে
'অহং' গীতটি গেও না রে।

৩ মন ভাব তারে মনে মনে।

৪ মহামোহের মোহ ছেড়ে
মন যদি হও মনের মত।

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃ ২৩০-৩১

৫ এ জগতে কি আর আছে।

—পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ ২৭০

ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা ও শিল্পাদর্শের প্রভাব যে উপেক্ষণীয় নয়, আশা করি প্রাথমিক সত্য হিসাবে তা নিঃসন্দেহেই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর সে প্রভাবের যথার্থ স্বরূপ কি তার বিশদতর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

৬

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন তার থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রতিই ঈশ্বরচন্দ্র অধিকতর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। উক্তপ্রকার অভিমত সংকলনের পূর্বে দুটি বিশেষ তথ্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় আরম্ভকালেই রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন (১৮৩৩)। এখানিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন—

"ঐ অপূর্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্যরূপে[১] বহুকালস্থায়িতার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন

১ 'ও প্রাচুর্যরূপে' কথা-দুটি আছে সাহিত্যসাধক চরিতমালা-র দশম পুস্তক 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' গ্রন্থে। যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে এই দুটি কথা বোধ করি অসাবধানতাবশতঃই বাদ গিয়েছে।

পুস্তক মুদ্রিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে…গ্রন্থকর্তার মহাকীর্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।"

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'সাধক-কবি রামপ্রসাদ' (১৯৫৪), পৃ ৩৬৯-৭০

এই উক্তির মধ্যেই রামপ্রসাদের এই গীতগ্রন্থটি সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের সনিষ্ঠ ও সতর্ক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কালীকীর্তনকে তিনি শুধু 'অপূর্ব গীতগ্রন্থ' বলেই নিরস্ত হন নি। তাকে তিনি রামপ্রসাদের 'মহাকীর্তি' বলেও বর্ণনা করেছেন এবং সেই মহাকীর্তিকে 'চিরস্থায়িনী' করবার অভিলাষও ব্যক্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাসিক 'সংবাদ-প্রভাকরে' অতীত কবিদের জীবনী-প্রকাশে ব্রতী হন তখন সর্বাগ্রেই প্রকাশ করেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত।

উভয় ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদের এই যে অগ্রাধিকার দান, এটা তাৎপর্যহীন নাও হতে পারে। মনে হয় অল্প বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত রামপ্রসাদের মহিমা তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল। বাসভূমি এবং জীবনকালের দিক্ থেকে ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদ যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটতর ছিলেন, হৃদয়ভাবের দিক্ থেকেও তেমনি তিনি তাঁর অন্তরের বেশি কাছাকাছি ছিলেন।

এবার ঈশ্বরচন্দ্রের এই মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন। উক্তিগুলি প্রায় সবই মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত এবং শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) সংকলিত। বিষয়বস্তুর কালক্রম এবং পাঠকের পক্ষে সহজ-লভ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটি উক্তির সঙ্গে সেটির উভয়বিধ উৎসেরই নির্দেশ দেওয়া গেল।

১। "বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন,…ইঁহার কৃত একটিও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতনভাবে পরিচিত হইতেছে, যখনি যাহা শুনা যায় তখনি তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে।"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৫৭

২। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন, যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্টনিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতাসকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৫০-৫৮

৩। "দশ বৎসর পর্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্যের [পুরাতন কবিদের জীবনচরিত সংগ্রহ ও প্রকাশ] দৃষ্টান্তদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের 'জীবনবৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালী-কীর্তন ও···শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।"

—'ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত', ভূমিকা ১৩৬২ আষাঢ় ১। 'কবিজীবনী', পৃ ২৯-৩০

প্রথম দুটি উদ্ধৃতিতেই রামপ্রসাদকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রামপ্রসাদকে স্পষ্টতঃই ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অপেক্ষাও উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থের ভূমিকাতেই যে রামপ্রসাদকে 'অদ্বিতীয় মহাকবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতেও নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতে রামপ্রসাদের স্থান ভারতচন্দ্রেরও উপরে এবং সেজন্যেই সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত কবিচরিতমালায় রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত 'সর্বাগ্রে প্রকটন' করা হয়েছিল।

পূর্বে বলেছি, ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই রামপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করতেন। তার এক প্রমাণ 'কালীকীর্তন' প্রকাশ (১৮৩৩)। তা ছাড়া, তার আরও দুএকটি প্রমাণ আছে। সংবাদ-প্রভাকরে (১২৬০ পৌষ ১। ১৮৫৩ ডিসেম্বর ১৫) প্রকাশিত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন'এর জীবনবৃত্তান্তে ঈশ্বরচন্দ্র জানান—

"পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ

করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একাল পর্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারি নাই।"

—'কবিজীবনী', পৃ ৬৪

তার প্রায় দুই বৎসর পরে সংবাদ-প্রভাকরে (১৮৫৪ অক্টোবর ১৭) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র এই 'মহাত্মা'র [রামপ্রসাদের] 'জীবনচরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশেরও অভিলাষ করেছিলেন।[১] এই বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়—

"এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি।"

—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা-১০, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', পৃ ৫০

এর থেকেই বোঝা যায়, কি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন।

৪

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের এত গভীর অনুরাগের কারণ কি, স্বভাবতঃই তাও জানতে ইচ্ছা হয়। রামপ্রসাদ ছিলেন 'কুমারহট্টনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব', আর ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কুমারহট্টের অদূরবর্তী কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ানিবাসী, তিনিও বৈদ্যকুলোদ্ভব। এই নৈকট্য এবং সাজাত্যবোধই ঈশ্বরচন্দ্রেব এমন শ্রদ্ধা ও আগ্রহের একমাত্র কারণ বলে মনে করা সমীচীন নয়। দুইজনই কবি, দুইজনের জীবনবোধেও সাদৃশ্য আছে। ধর্মবোধ জীবনবোধের ভিত্তি। তাঁদের এই ধর্মবোধের সাদৃশ্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের ধর্মবোধ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়। এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদকে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বা অদ্বিতীয় 'মহাকবি' বলেই নিরস্ত হন নি, তাঁকে একাধিকবার 'মহাত্মা'

১ কিন্তু তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। রামপ্রসাদের জীবনচরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। কারণ জীবনচরিত রচনায় উপকরণ সংগ্রহের কাজ তিনি তাঁর জীবনে শেষ করে উঠতে পারেন নি।

বলেও অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক ও গভীরভাবে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যথাস্থানে এ-বিষয়ে আরও একটু পরিচয় দেওয়া যাবে। ঈশ্বরচন্দ্রের আন্তরিক সংগীতপ্রীতিও তাঁর এই অনুরাগের অন্যতম কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি তাঁর সহজাত কাব্যভাব ও রসগ্রাহিতা। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের যে-উক্তিটি সর্বপ্রথমে উদ্‌ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেই তাঁর এই ভাব ও রসগ্রাহিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এ স্থলে আরও দুএকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করলেই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার সত্য পরিচয় পাওয়া যাবে।—

১। "রামপ্রসাদী পদসকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে।"

—সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬০ আশ্বিন ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৩৩৮

২। "ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের [রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের] এক-এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থপ্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।···

এই মহাশয় আগমনী, সপ্তমী, বিজয়া, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীররসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণনা-ঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না।"

—সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬০ পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৫৮-৫৯ এবং ৬৬-৬৭

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও এই অনুমান করা অসংগত হবে না যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রভাব গভীরতর হওয়াই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বস্তুতঃ রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার পারস্পরিক তুলনা করলে এই অনুমানের সত্যতাই প্রতীয়মান হবে। অন্ততঃ ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের গভীর প্রভাব সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন হবে। এই

প্রভাব ভাবে, ভাষায়, অলংকারে ও ছন্দে। অতঃপর একে একে এসব প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু তৎপূর্বে এসব প্রভাবের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এক স্থানে এই মন্তব্য করেন।—

"কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই।"

—সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬১ অগ্রহায়ণ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৩৪৪-৪৫

এর থেকে বোঝা যায়, খাঁটি বাংলা সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরের মূল প্রেরণা। আর, এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তিনি রামপ্রসাদের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। কারণ বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল রামপ্রসাদের মধ্যেই। ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি, তাঁর রচনায় পাই একটা সাহিত্যিক আভিজাত্য ও শৈল্পিক কৃত্রিমতা, সাধারণের পক্ষে তা দুরধিগম্য। আর রামপ্রসাদ ছিলেন বাঙালির জাতীয় কবি, তাঁর রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর পদগুলিতে কোনো কৃত্রিমতা বা ভেজাল নেই, তাতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার। তাঁর ভাষা সকলের মুখের ভাষা, তাঁর ছন্দও চলতি ভাষারই ছন্দ, তাঁর অলংকার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাজাত এবং তাঁর ভাব সর্বসাধারণের উপলব্ধিগম্য। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য বিশেষ-ভাবে তাঁর সংগীতরচনাগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সব রচনা সম্বন্ধে নয়। এই গানগুলিই তাঁকে অমরতা দান করেছে, তাঁকে জাতীয় কবির আসনে বসিয়েছে। তিনি সাধারণের কবি, অথচ অনন্যসাধারণ। এই বিশিষ্টতাই ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর-একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। তাতে রামপ্রসাদের এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে।—

"কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা

ছিল। ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন। কস্মিন্ কালে দৎ-কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যেসমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন।"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৪৮

রামপ্রসাদের অনুগামী ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক পরিমাণে এই গুণগুলির অধিকারী হয়েছিলেন। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"আজিকার দিনের···বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা।"

—'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা, উপক্রমণিকা

অর্থাৎ রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও 'খাঁটি বাঙ্গালী' কবি, বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির প্রতিভূ।

৬

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবগত সাদৃশ্যের প্রধান সূত্র ধর্ম। রামপ্রসাদকে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার 'মহাত্মা' বলে সুখ্যাতি করেছেন এবং তাঁকে 'পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক' বলে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন 'ধর্মাত্মা'। ধর্মভাবই তাঁর চরিত্রের মূলকথা। এসম্বন্ধে তিনি বলেন—

"পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে-পদ্যে যত লিখিয়াছেন এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই।···এইসকল গদ্যপদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল।···বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না।"

—'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা (কবিত্ব), পৃ ৬৬-৬৭। ভবতোষ সং, পৃ ৩৭ ৩৮

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের এই ধর্মপ্রাণতা ও ভাবসাদৃশ্যের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই—

"বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর-এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না। কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন— ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।"

—'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা (কবিত্ব), পৃ ৬৮-৬৯। ভবতোষ সং, পৃ ৩৯

এই দুইজনের ধর্মভাবগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃভাব সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সেরূপ আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। উভয়ের ধর্মভাবের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সাধারণ মন্তব্য এই।—

"যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।"

—পূর্ববৎ, পৃ ৭৬। ভবতোষ সং, পৃ ৪৪

এই অগ্রবর্তিতার অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন—

"ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যহেতু সেসকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত

ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা উপাসনাদি করিতেন। এজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।”

—‘কবিতাসংগ্রহ’, ভূমিকা (কবিত্ব), পৃ ১৮-১৯। ভবতোষ সং, পৃ ৪৫

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী পাঠেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সমর্থিত হয়। তিনি কোনো উপধর্মে বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর স্বীকৃত ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর উপাস্য। সাকার ঈশ্বরকল্পনায়, মূর্তিপূজায় ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর আস্থা ছিল না। শুধু তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ নয়, তাঁর ‘বোধেন্দুবিকাস’ নাটক থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায় কিনা সন্দেহ। তৎকালীন সাধারণ হিন্দুর তুলনায় অগ্রবর্তী হলেও তখনকার যশস্বী ব্যক্তিদের তুলনায় তাঁকে অগ্রবর্তী বলা যায় না। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে হিসাবে আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সে হিসাবে আপন কালের অগ্রবর্তী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের অনুবর্তীই ছিলেন। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখা বোধ হয় এই অনুবর্তনেরই ফল।

কিন্তু রামপ্রসাদকে নিঃসন্দেহেই আপন সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায়। রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের বহু পূর্বেই তিনি যে ধর্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, বাংলার ইতিহাসে তা একটি বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর কোনো সহায়সম্বল ছিল না। শুধু সহজাত হৃদয়প্রবৃত্তি ও কণ্ঠনিঃসৃত গানের সম্বল নিয়ে তিনি বাংলাদেশের মনোজগতে যে নিঃশব্দ ধর্মবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। পরবর্তী শতাধিক বৎসরে বাংলাদেশে ধর্মের যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার সুনিশ্চিত ভূমিকা রচিত হয়েছিল রামপ্রসাদের গানের দ্বারা। তার মধ্যে সুগভীর অনুভূতি আছে, সংশয়হীন সত্যোপলব্ধি আছে, হৃদয়জয়ের দুর্নিবার শক্তি আছে— অথচ তার কোনো সাড়ম্বর বহিঃপ্রকাশ নেই। রামপ্রসাদের ধর্মভূমিকার স্বরূপ ও গুরুত্ব প্রথম অনুভব করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বস্তুতঃ ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে তিনি রামপ্রসাদেরই যথার্থ অনুবর্তী। এই অনুবর্তিতাই তাঁকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তন করতে সহায়তা করেছিল। ছোটবেলা থেকে রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে তাঁর

হৃদয়ে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হতে বেশি সময় লাগে নি।

এবার রামপ্রসাদের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। আশা করি তার থেকে পূর্বোক্ত অভিমতের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।—

১। "নিরাকারবাদীরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি 'কালী' নাম উচ্চারণপূর্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন।···উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয় পক্ষেরি তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থপর্যটনাদি ক্রিয়াকর্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন।···

সেন সদাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন, 'যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না'।"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০, আশ্বিন ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৩৩৭-৩৮

২। "তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য বিষয়সকল লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্নচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন।···তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করে অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপাসোনার উপাসনা তাহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০, পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৪৮

৩। "ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হইয়া প্রীতিচিত্তে গীত-ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদী পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদীরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন, ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য

ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয়পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থপক্ষে উভয়েরি মর্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।"

—সংবাদ-প্রভাকর ১২৬০, পৌষ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৬২

৪। "যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন। পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশকালপাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন। তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্‌ভিন্ন তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক আর ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সকলিই তাঁহার উদ্দেশে বলিয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃত কর্মের হানি হয় না। যথা গোলাব পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেনকবির কালীনামাদি উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।…
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে
তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে॥"

—সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬০, মাঘ ১। 'কবিজীবনী', পৃ ৮২

রামপ্রসাদের গানগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র যে উদার বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সে আদর্শের প্রতি তাঁর নিজেরও যে আন্তরিক অনুমোদন ছিল তা এই উদ্ধৃতিগুলির ভাষাতেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ রামপ্রসাদ

ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ যে মূলতঃ অভিন্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত অভিমত যে সত্য তাতে সন্দেহ থাকে না।

প্রশ্ন হতে পারে রামপ্রসাদী ধর্মের ঈশ্বরচন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা। অর্থাৎ তা ঈশ্বরচন্দ্রের আরোপিত স্বীয় মতের প্রতিরূপমাত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই প্রশংসনীয় তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কেননা প্রতি পদেই তিনি রামপ্রসাদের গান উদ্‌ধৃত করে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন এবং পদাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেও ঈশ্বরচন্দ্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। এ স্থলে উক্ত কালীকীর্তন ও পদাবলী থেকে কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্‌ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

আকার তোমার নাই, অক্ষয় আকার।
গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার-ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর, নির্বাণ কে চায়॥

—'কালীকীর্তন', মায়ের গোষ্ঠে গমন

কালীকীর্তন রামপ্রসাদের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। দেখা যাচ্ছে সে বয়সেই তাঁর মন ঈশ্বরের স্বরূপচিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, ফলে তিনি তখনও সাকার-নিরাকার ভাবনার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন নি। তখন তাঁর চিন্তা এই দুই তত্ত্বের মধ্যে দোলায়মান ছিল। তবে তাঁর হৃদয়ের ঝোঁক ছিল সাকারের প্রতি। এটা যে 'বুদ্ধির তারল্য'-সূচক, তাও তিনি জানতেন। কিন্তু পরিণত জীবনে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উত্তরকালীন পদাবলী-রচনায়। যেমন—

আর কাজ কী আমার কাশী।
ওরে, কালীপদ কোকনদ
তীর্থ রাশি রাশি॥

ওরে, হৃৎকমলে ধ্যানকালে
আনন্দ-সাগরে ভাসি।...
গয়ায় করে পিণ্ডদান
পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান
তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি—
বটে সে শিবের উক্তি;
সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি তার দাসী॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে—
করুণানিধির বলে
চতুর্বর্গ করতলে
ভাব্‌লে এলোকেশী॥

—'কবিজীবনী', পৃ ৩৩৬

মা আমার অন্তরে আছ।...
উপাসনা-ভেদে তুমি প্রধান্ মূর্তি ধর পাঁচ।
যে পাঁচেরে এক্ করে ভাবে, তার হাতে কোথা বাঁচ॥...
প্রসাদ্ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে
মনোময়ী হোয়ে নাচ॥

—'কবিজীবনী', পৃ ৭৮

প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

—'কবিজীবনী', পৃ ৫৯

এমন দিন কি হবে তারা।...
(যবে) ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে
যা বিরাজে সর্বঘটে—
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে
তিমিরে তিমিরহরা ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী-৭১

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী-৭৯

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও অনুরূপ মনোভাবের অভাব নেই। এখানে কয়েকটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত হল।—

লোকাচারে দেশাচারে
জাতিপ্রথা ব্যবহারে
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস
এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই
সত্যসভা ছাড়া হই,
তোমা-ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার
আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয় ?
যদ্যপি তোমায় স্মরি
সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।

অনাচারী নিজে যারা
অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞান হত ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), তত্ত্ব, পৃ ২০

এক ভিন্ন নাহি আর,
তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাকার
হৃদয়ে উদয় ।
অনিত্য বিষয়বিত্ত
নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত,
নিত্য নিরাময় ॥

—পূর্ববৎ, শরীর অনিত্য, পৃ ১০

বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব ।
বোধ হয় ব্রহ্মময় সমুদয় ভব ॥

—পূর্ববৎ, মনের প্রতি উপদেশ, পৃ ৪২

তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর ।
সদা এক-জ্ঞানে থেকে এক-ধ্যানে
জীবন সফল কর ॥

—পূর্ববৎ, তত্ত্বজ্ঞান, পৃ ৪৪

কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা ।
কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা ॥
মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও ।
ফলে তুমি একমাত্র, তুমি ছাড়া নও ॥

—পূববৎ, নিবেদন, পৃ ৪৯

একেতেই সব হয়,
একেতেই সব লয়,

একেতেই একময় সব একাকার।
এক বিনা আর নাহি, এক বিনা আর ॥

—পূর্ববৎ, তত্ত্ববোধ, পৃ ৮১

পেয়েছি পরম নিধি,
না মানি নিষেধ-বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি,
আর নাহি ভেদ গণি,
এ জগতে সমান সবাই ॥
এই আমি আমি নই,
এই আমি আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মময় সমুদয়,
ব্রহ্মছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার ॥

—পূর্ববৎ, ব্রহ্মজ্ঞান, পৃ ৯৩

আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। আশা করি এর থেকেই বোঝা যাবে যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ তথা জীবনবোধ মূলতঃ অভিন্ন। উভয়ের ধর্মভাবনাই আসলে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর, উভয়েই সে বিদ্যাকে নিছক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এটাই হল আধুনিক ভাবতের ধর্মসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দিক্ থেকে বিচার করলেও বোঝা যাবে যে,—রামপ্রসাদকেই আপন কালের অগ্রবর্তী বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তা বলা যায় না। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মভাবনায় যে মূলগত ঐক্য লক্ষিত হয় তা নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। অন্ততঃ আংশিকভাবে এটা ঈশ্বরচন্দ্রের আবাল্য মনোবিকাশের উপরে রামপ্রসাদের প্রতিভার প্রায় অলক্ষিত অথচ সুগভীর প্রভাবের ফল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বভাবনা অনেকাংশে রামপ্রসাদের অনুরূপ হলেও তাঁর কবিভাবনায় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তার কবিভাবনায় রূপ-

কল্পনারও স্থান ছিল। সে ক্ষেত্রে দেখি শিবের ভাবমূর্তি তাঁর কল্পনাকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করত। যেমন—

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ॥
উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
বাস্তবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই॥
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।
সদাই অচলা ভক্তি তাতেই আমার॥
মহাযোগী জ্যোতির্ময় যোগে অনুরত।
কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মনের প্রতি উপদেশ, পৃ ৪১

এ প্রসঙ্গে অধিকতর অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক। তবে এখানে এটুকুমাত্র বলা যেতে পারে যে, কবিকল্পনার ক্ষেত্রে শিবের প্রতি এই যে অন্তরের টান আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বোধ করি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এবং তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

এই কারণে নানা উপলক্ষেই ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় শিবের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন—

অশিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও,
শিব রব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার দেহে আর পাপভার ভরো না।

—পূর্ববৎ, জীবের প্রতি, পৃ ৩৪

এ ভব-বিষয় সব শিবময়, শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব, অশিব কি আছে তব॥

—পূর্ববৎ, ঈশ্বরের করুণা, পৃ ৩৪

শিবের কৈলাস-ধাম,
শিবপূর্ণ বটে নাম—
শিবধাম স্বদেশ তোমার।

—পূর্ববৎ, স্বদেশ, পৃ ৩৩১

শুধু শিব নয়, বিশ্বশক্তির কালীরূপা মাতৃমূর্তি, কল্পনাতেও কবি ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিধা ছিল না। তাই বিশেষ ভাববেশে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই উক্তি—

শিব শিব কালি কালি কালের ঘরণী।
প্রসীদ প্রসীদ মা গো ব্রহ্মসনাতনী॥
এইভাবে ক্ষণকাল যদি করি ক্ষয়।
একেবারে সদানন্দে হয়ে যাব লয়॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মনের প্রতি উপদেশ, পৃ ৪২

শুধু কালী নয়, রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিচিত্তে বিশ্বদেবতার বহু ভাবমূর্তি কল্পনারও যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু এসব মূর্তিকল্পনা যে জগতের চরম সত্য নয়, এ বিষয়েও তিনি রামপ্রসাদের মতোই পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর মনোভাবও তাঁর রচনায় অকুণ্ঠিত ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।—

উদ্ধারের পাঁচ মত ফলিতার্থ এক-পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হলে যায় খেদ।
শিব রাধা তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা শ্যাম আকারের ভেদ॥
তুমি শ্যাম তুমি শ্যামা, আকারে আকার বামা।
একাকারে একাকার লয়।
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয়, শিব সেই হয়॥

—পূর্ববৎ, মহাকালীর স্তব, পৃ ১১১

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বদেবতার বহুমূর্তি কল্পনায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চরম সত্যের বিচারে সেই কল্পনা-অতিক্রমণে ঈশ্বরচন্দ্র এক দিকে যেমন ছিলেন রামপ্রসাদের অনুবর্তী, অপর দিকে তেমনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী।[১]

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, উভয়েরই প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম। তাই অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই এ বিষয়ের আলোচনা করা গেল।

---

১ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য শ্রীমতী পম্পা মজুমদার-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' গ্রন্থ (১৩৭৯ শ্রাবণ) দেবকল্পনা-প্রসঙ্গ, পৃ ১৯৮-২৩৫।

এই দুই কবির রচনাগত সাদৃশ্য শুধু যে ধর্মভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ভাষা, অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়। অতঃপর আমরা একে একে এই কাব্যাঙ্গগত সাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হব।

সংস্কৃতির প্রধান বাহন **ভাষা**। তাই রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা অসংগত হবে না। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে 'মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি'-প্রসঙ্গে বলেন—

পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সেসকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনীমিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্য রস লয়ে॥

রাজসভার অভিজাত কবির এই উক্তিতে জ্ঞানাভিমান ও আত্মাদরের সুর যেন একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে অনভিজাত ও নিরভিমান রামপ্রসাদের পদগুলিতে যে সহজ প্রসাদগুণ ও রসালতা স্বতঃপ্রকাশ, ভারতচন্দ্রের রচনায় তা দুর্লভ। অথচ রামপ্রসাদের রচনাও কম 'যাবনীমিশাল' নয়। যেমন—

১ মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-'জমিন' রইল পতিত
'আবাদ' করলে ফলত সোনা॥

২ আমায় দেও মা 'তবিলদারী'।
আমি 'নিমকহারাম' নই শঙ্করী॥

রামপ্রসাদের রচনায় 'যাবনী' শব্দের নিঃসংকোচ প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'মানব-জমিন' শব্দে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও আরবি শব্দের মধ্যে যে অপূর্ব সৌভ্রাত্রবন্ধন ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। গুরুচণ্ডালী পদ্ধতি রামপ্রসাদের রচনার দোষ নয়, গুণ। রামপ্রসাদের প্রতিভাবলে এটা 'দোষ হয়েও গুণ হৈল'।

রামপ্রসাদের ভাষার যে গুণ ও যে বৈশিষ্ট্য, অনেক পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষারও সেই গুণ, সেই বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনাতেও 'যাবনী' শব্দের অভাব নেই। যেমন— 'ইংরেজী নববর্ষ' (১৮৫২) কবিতার এই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি—

বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

এর শুধু অলংকারের ঝংকারটুকু নয়, দেশী কথার সঙ্গে বিদেশী কথার মিশোলটুকুও রমণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় চলতি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে অজস্র পরিমাণে। এই মিশ্রণ অনেক স্থলেই বেমালুম। এই সব মিলেই খাঁটি বাংলা। এই বাংলা তিনি পেয়েছিলেন অংশতঃ ভারতচন্দ্র ও মুখ্যতঃ রামপ্রসাদের উত্তরাধিকার হিসাবে।

'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ('কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা, পৃ ৭৪। ৪৩) রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই দুই কবির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৮

অলংকার প্রয়োগেও ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক পরিমাণই রামপ্রসাদের অনুবর্তী তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নজরে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় **অর্থালংকার** প্রয়োগের বিরলতা। এই বিরলতার দ্বারা কল্পনার দীনতাই সূচিত হয়। এইজন্যই তাঁর রচিত কবিতা পড়তে অনেক সময় রসহীন বক্তব্যসার গদ্যপ্রবন্ধের মতো বোধ হয়। কল্পনা তথা অলংকারের দৈন্যই তার প্রধান কারণ। কেননা অলংকার তো কাব্যের বহিরঙ্গ বা ভূষণমাত্র নয়, কাব্যাত্মার প্রকাশরূপেরই নাম অলংকার। এই হিসাবে রামপ্রসাদের স্থান ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক উপরে। তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রায় সর্বত্রই অলংকারের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়।

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন, সেসব স্থলে তিনি প্রায় রামপ্রসাদের পথেই চলেছেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে বলেছেন যে, তিনি 'অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহারি

বর্ণনা করিতেন'। রামপ্রসাদের পদাবলীর সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই ঈশ্বরচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করবেন। তবু পূর্ণতার খাতিরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ওরে মন চড়কী, ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
ওরে মায়া-ডোরে বড়্‌শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥

—'কবিজীবনী', পৃ ৫৪

ধৈর্য খোঁটা ধর্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি করতে পারে, মহাকাল রক্ষক রোয়েছে।

—পূর্ববৎ, পৃ ৬২

এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট করে বসেছি ঘাটে,
ও মা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে,
নেয়ে লবে গো।
দশের ভরা ভোরে লায়
দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ও মা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো।

—পূর্ববৎ পৃ ৬৫

মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী ১২৪

মন রে, কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা॥

—পূর্ববৎ, পদাবলী ১২৭

অলংকার রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত চিরাগত উপমাস্থলগুলি বর্জন করে নিত্যপরিচিত অথচ অবহেলিত তুচ্ছ বিষয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এ কথা কারও অজানা নেই। তবুও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধির সহায়তা হবে। দৃষ্টান্তগুলি প্রায় সবই বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী (প্রচলিত) থেকে সংকলিত।—

লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে।
পিটেপুলি পেটে যেন ছিটে-গুলি ফোটে॥···
কর্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়িপ্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥

—'কবিতাসংগ্রহ', পৌষপার্বণ, পৃ ৭৪। গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ ১২২

ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিতে সামান্য আনারসও দেখা দিয়েছে অসামান্য রূপ নিয়ে।—

ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), আনারস, পৃ ১৩৩

নীলকান্তমণির তুলনাটাতে নূতনত্ব নেই। কিন্তু রূপসীর চোখ-ওঠার তুলনাটা অসাধারণ। এ-রকম সাদৃশ্য কল্পনায় ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয়।

ফুলকপির বর্ণনাটাও কম অভিনব নয়।—

মনোহর ফুলকপি, পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), হেমন্তে বিবিধ খাদ্য, পৃ ১৫১

খয়রা মাছও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের তুলনার গুণে।—

নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
'খয়রার' পেট যেন ময়রার ঘর॥

—পূর্ববৎ, পৃ ১৫২

মিলন প্রার্থনায় কামিনীর উক্তি।—

পান-খয়েরের প্রায় তোমায় আমায়।
উভয়ে একত্র যোগ, কত ভোগ তায়॥

—পূর্ববৎ, মানভঞ্জন, পৃ ১৮৬

'ঋতুপতি' বর্ষার বেশবর্ণনাটাও উপভোগ্য। গায়ে তার ঢিলে-আস্তিন সাটিনের জামা, গলায় সোনার হার, আর পায়ে জরির লপেটা।—

সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল,
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে ঢিলে॥
সোনার দামিনী-হার গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা লতা পায়॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), বর্ষা, পৃ ২১৫

এরকম কল্পনার দৃষ্টি কবি ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্র যে চিরাভ্যস্ত উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও অপটু ছিলেন না তা বলা বাহুল্য। পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং পরেও যেসব দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত হবে তার প্রতি একটু মন দিলেই এ কথা বোঝা যাবে। তবু আশু উপলব্ধির জন্য এখানে আরও কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

প্রথমে রামপ্রসাদ—

আসার আশা আশা, কেবল আসামাত্র হোলো।
চিত্রের কমলে যেমন, ভৃঙ্গ ভুলে গেলো॥[১]

—'কবিজীবনী', পৃ ৯৭

ত্যজ মন, কুজন-ভুজঙ্গম-সঙ্গ।
কাল মত্তমাতঙ্গেরে, না কর আতঙ্গ॥…
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্মিকে কি কর্ম ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ॥

—পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯৯-৪০০

১ পাঠান্তর: গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী, সং ১৩২—
কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আশা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো॥

ডুব দে মন কালী ব'লে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।…
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী ১২২

এবার ঈশ্বরচন্দ্র—

হেরে সে বিমল মুখ নয়নে উপজে সুখ
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর সশঙ্কিত নিরন্তর
গুরু পরিবাদ-রাহুভয়ে॥

—'কবিতাসংগ্রহ', প্রেমনৈরাশ্য, পৃ ২৬৮। গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ ১৭১

ভাবের করিয়া সৃষ্টি প্রতিবাক্যে প্রীতিবৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসনে ঢাকা
নয়নের পলকে পলকে॥…
থেকে থেকে আড়ে আড়ে আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্ধফোটা পদ্ম-ফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে॥

—'কবিতাসংগ্রহ', প্রণয়, পৃ ২৭৩ ৭৪। গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৃ ১৭২

কিন্তু এসব চিরপ্রয়োগসিদ্ধ অভিজাতবর্গীয় অলংকার রচনা রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্রের আসল কৃতিত্বের বিষয় নয়। অনভিজাত ও অতিপরিচিত বস্তুকে অলংকাররূপে প্রয়োগ করে অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব সৃষ্টিতেই তাঁদের আসল কৃতিত্ব। এসব অনভ্যস্ত অলংকার প্রয়োগের দ্বারা সাহিত্যে যে নূতন রকমের রস উৎপন্ন হয় তার স্বাদবৈচিত্র্য আছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের সৃষ্ট রসেও স্বাদের পার্থক্য যথেষ্টই আছে। তার কারণ তাঁদের রসসৃষ্টির ক্ষেত্র ও লক্ষ্য পৃথক্। যেমন,— রামপ্রসাদের বিষয় ধর্মগত এবং তার সুর অনেকাংশেই লিরিক ধরনের, আর ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার

বিষয় বিচিত্র এবং লিরিক সুরের বিরলতা তাঁর রচনাবলীর একটি প্রধান অভাব। কিন্তু সে আলোচনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলেও তাঁদের অনুভূতি-প্রকাশ তথ্য অলংকারগত রসসৃষ্টির পদ্ধতি ছিল অভিন্ন। কবিচিত্তের বিষয়কে শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করবার প্রয়োজনে যে-কোনো তুচ্ছ আটপৌরে বস্তুকে অলংকাররূপে মেনে নেওয়াই হল সে পদ্ধতি। শব্দ বাছাই করার বেলায় যেমন, অলংকার রচনার বেলাতেও তেমনি চিরাগত সংস্কার ও প্রথা লঙ্ঘন করে অভিজাত-অনভিজাত-নির্বিবেশে যে-কোনো বস্তুকে বিনা দ্বিধায় মর্যাদার আসনে স্থান দেওয়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই হল আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই সাহিত্যিক ডিমোক্রেসির যুগে অলংকার রচনার বেলাতেও গুরুচণ্ডালী-বিধানের আর কোনো বালাই নেই। এই হিসাবেও রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রকে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে স্বীকার করতে হয়। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে কালক্রম তথা গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকারের মর্যাদা রামপ্রসাদেরই প্রাপ্য।

দেখা গেল অর্থালংকার রচনায় রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্ধতি বহুলাংশ এক ধরনের হলেও একে অন্যের অনুবর্তী নন। অর্থাৎ এক জনের উপরে অপর জনের কোনো লক্ষণীয় প্রভাব নেই।

কিন্তু **শব্দালংকার** রচনার বেলায় এ কথা বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখন তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

এ কথা সুবিদিত যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান দোষ তাঁর শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

> "শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাসযমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।···ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই— কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাসযমকে বড় পটু— তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল।··· এই অলংকারপ্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই— এত

অনুপ্রাসযমক আর কোনো বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

…ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই, বিষয়-অবিষয় নাই, সীমা-সরহদ্দ নাই —একবার অনুপ্রাসযমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে।"

—'কবিতাসংগ্রহ', ভূমিকা, পৃ ৭১-৭২। ভবতোষ সং, পৃ ৪০-৪১

ঈশ্বরচন্দ্রের এই শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অনুপ্রাসযমকের প্রতি তাঁর এই আগ্রহাতিশয্যের উৎস কোথায়, বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে নীরব। অন্য অনেকের মতো তাঁরও হয়ত ধারণা ছিল যে, পূর্বগামী কবিওয়ালা ও পাঁচালিওয়ালাদের প্রভাবেই তাঁর মধ্যে এই শব্দাড়ম্বর তথা শব্দানুপ্রাসপ্রিয়তা দেখা দিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্রের আদিগুরু ছিলেন রামপ্রসাদ। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার যে দোষ, রামপ্রসাদের রচনারও সেই দোষ। রামপ্রসাদী রচনার যমকানুপ্রাসবাহুল্য কম পীড়াদায়ক নয়।

এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হওয়া যাক। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' কাব্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল তাঁর অল্প বয়স থেকেই, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কাব্যের এক স্থানে আছে—

"গিরিশ-গৃহিণী গৌরী, গোপবধূ-বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি, প্রথম বয়েস ॥…
জগদম্বারে, রব পূরে বেণু।
রব পূরে বেণু, ধায় বৎস ধেনু।
উড়ে পদরেণু, রেণু ঢাকে ভানু।
ভাবে ভোর তনু।" ইত্যাদি

—'কবিজীবনী', পৃ ৬১; কালীকীর্তন (বসুমতী-গ্রন্থাবলী), পৃ ৭

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রাস-প্রীতির আদি-উৎস। এই উদ্ধৃতির দুই অংশে দু-রকম অনুপ্রাস, এটাও লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও এই দু-রকম অনুপ্রাস দেখা যায়। রামপ্রসাদের 'কষিতকাঞ্চনকান্তি' কথাটিকে ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রসসৃষ্টির প্রয়োজনে যে-রকম অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা সত্যই উপভোগ্য।

'কষিতকাঞ্চনকান্তি' কমনীয় কায়।
গাল-ভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), এণ্ডাওয়ালা তপ্‌স্যা মাছ, পৃ ১২৯

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে॥…

রাম্‌প্রসাদ কহিছে শুন, মা, জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকি,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

—'কবিজীবনী', পৃ ৮৪

এখানে 'তনয়' ও 'জানকী' শব্দে যমক অলংকার প্রয়োগের দ্বারা চমক সৃষ্টির প্রয়াসটুকুই শুধু লক্ষণীয় নয়, অনুপ্রাসের খাতিরে 'কানকী' ও 'ধানকি'র ন্যায় অর্থহীন শব্দ রচনার হাস্যকর কিম্বা বিরক্তিকর প্রয়াসটুকুও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রেও রামপ্রসাদ দাশরথি রায় তথা ঈশ্বরচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। এ-রকম প্রয়াস দেখে মনে হয়—

"অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাইভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না।"

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও অনেক স্থলেই সমভাবে প্রযোজ্য। ছন্দ-আলোচনা-প্রসঙ্গে এ-রকম কিছু দৃষ্টান্ত যথাস্থানে উদ্‌ধৃত করা যাবে।

যা হক, 'তনয়' শব্দ নিয়ে উক্তপ্রকার ছেলেখেলার দৃষ্টান্তটির প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের 'বড়দিন' কবিতার (বসুমতী গ্রন্থাবলী, পৃ ১৩১)—

'দোষের ত নয় তবে ঘোষের তনয়।'

এই পঙ্‌ক্তিটির কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। রামপ্রসাদের রচনা থেকে এরকম যমক প্রয়োগের আর-একটি দৃষ্টান্ত (বসুমতী গ্রন্থাবলী, পদাবলী, ১৯৩) দিচ্ছি।—

কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে,
মোহিত করেছে ছিন্নবেশে।

এর সঙ্গে তুলনীয় ঈশ্বরচন্দ্রের এই দুই পঙ্‌ক্তি।—

আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়, পৃ ২৮৬

ভাল করে খুঁজলে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এরকম সাদৃশ্যের আরও অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

রামপ্রসাদের এই বিখ্যাত পদটিও (পদাবলী, ৭১) এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

এখানে 'তারা বেয়ে' না লিখে 'নয়ন বেয়ে' লিখলে ক্ষতি হত না, হয়ত ভালই হত। কিন্তু কবি যমক রচনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্বে দেখেছি তাঁর অনুপ্রাসের মোহও কম ছিল না। তার আর-একটি দৃষ্টান্ত ('কবিজীবনী', পৃ ৬৫) দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি।

প্রসাদ বলে পাষাণ্ মেয়ে,
আসান্ দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে,
ভবার্ণবে গো।

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায় রামপ্রসাদের যেসব রচনা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংকলন করেছিলেন এবং যেগুলির প্রশংসায় তিনি বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে এরকম যমক-অনুপ্রাস নিয়ে খেলার বহু নিদর্শন আছে। হয়তো এটাও সেগুলির প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ।

যা হক, রামপ্রসাদের রচনা যে ঈশ্বরচন্দ্রের শব্দালংকারপ্রীতির একটি প্রধান উৎসস্থল, আশা করি এখন সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিশেষ অবকাশ নেই।

ছন্দ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে আলোচনারও সার্থকতা আছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ বিষয়টির গুরুত্বরক্ষা সম্ভব নয়। তাই ছন্দের ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের আপেক্ষিক কৃতিত্বের বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা গেল।[১]

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে—
হৃদয়ে তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্বাক্॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে॥

—রবীন্দ্রনাথ

১ দ্রষ্টব্য 'ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৩ কার্তিক-পৌষ এবং মাঘ-চৈত্র সংখ্যা।

কবি রামপ্রসাদ সেন

দেশভক্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের অন্তরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে,—
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের রচনায় বাংলা দেশের প্রাণের কথা যেমন গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, অধুনাপূর্ব কালে আর কারও রচনায় তেমনভাবে পায় নি। অথচ এই দুইজনের মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন দীর্ঘ, তাঁদের রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্যও তেমনি গভীর। চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ; তাঁর রচনা চৈতন্যদেবের (১৪৮৫-১৫৩৩) খুব প্রিয় ছিল। রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১) আবির্ভূত হয়েছিলেন মোগল আমলের শেষ দিকে এবং তাঁর তিরোভাব ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভে ওআরেন হেস্টিংসের শাসনকালে। চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব, রাধাকৃষ্ণের ভক্ত; আর রামপ্রসাদ শাক্ত, কালীর উপাসক। চণ্ডীদাস প্রেমিক এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রূপান্তরিত করে সে প্রেমকে স্থাপিত করেছেন ধর্মের ভাবলোকে। রামপ্রসাদ ভক্ত, তাঁর ভগবদ্ভক্তি মাতৃভক্তির বহু বিচিত্র ভাবের মধ্যে নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। নরনারীর প্রেম-সম্পর্ককে তিনি ভগবদ্-উপলব্ধির উপায়রূপে স্বীকার করেন নি; মাতাপুত্রের স্নেহ-সম্পর্কই তাঁর সাধকজীবনের প্রধান অবলম্বন। অথচ উভয়েই এই দুই ভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে বাংলা দেশের গভীরতম অনুভূতিকে পূর্ণতম প্রকাশ দান করেছেন। মোট কথা, এই দুই কবি বাঙালির হৃদয়কে যেমন একান্তভাবে অধিকার করেছেন, প্রাচীন কালের আর কোনো কবি তা পারেন নি। বাংলার জনস্মৃতিতে এই দুই কবির জীবন যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, আর কোনো কবি সম্বন্ধেই তা হয় নি। ফলে এই দুই কবি সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতির উদ্ভব হয়েছে, যেমন হয়েছে ভারতের মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে। জনশ্রুতির এই বাহুল্য জনহৃদয়ের অনুরাগেরই

পরিচায়ক। বাংলার অন্যান্য বড় কবি কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে জনশ্রুতির এমন আধিক্য দেখা যায় না।

চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ উভয়েই স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের গানের জন্য। শুধু গান নয়, তাঁরা দুজনেই বড় কাব্যও রচনা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বড় কাব্যগুলির কোনোটাই খ্যাতি লাভ করতে পারে নি। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক বড় কাব্যটি তো বাঙালির মন থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।[১] ইদানীং কালে এ কাব্যটির একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের ঔৎসুক্যতৃপ্তির বিষয় হয়ে রয়েছে; সাহিত্যরসিকদের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারে নি বললেই হয়। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটিও পাঠকসমাজের অনাদরের মধ্যেই তলিয়ে গেছে। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসের পাশেই রামপ্রসাদের স্থান। গানের জাদুমন্ত্রে এঁরা বাংলার মনকে চিরকালের মতোই হরণ করে নিয়েছেন। সে গানের জাদুক্রিয়ার প্রভাব দীর্ঘকালের ব্যবধানেও আজ পর্যন্ত কিছুমাত্র নিষ্ক্রিয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মতো মহামনস্বী কবিও এই দুই গীতিকারের মোহন প্রভাবকে সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন। আরও একটি বিষয়ে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনই দুটি যুগের প্রবর্তক বলা যায়। রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে চণ্ডীদাস যে প্রেম-সংগীত রচনার সূত্রপাত করেন, তাঁর পরে দীর্ঘকাল ধরে সে রীতির অনুবর্তন চলল বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে। শ্যামাসংগীত রচনায় রামপ্রসাদের অনুবর্তনকারীর সংখ্যা বা জনপ্রিয়তাও কম নয়।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা দেশে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাঁদের সকলের উপরে দুটিমাত্র নাম উজ্জ্বলবর্ণে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ। দুইজনই ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা সাহিত্যরসিক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়কবি। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে "রায় গুণাকর" এবং রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু দুইজনের কবিপ্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। ভারতচন্দ্র ছিলেন সভাকবি, রাজসভার মর্যাদা রক্ষার উপযোগী অভিজাত শ্রেণীর মহাকাব্যের তিনি রচয়িতা। অলংকৃত

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস অভিন্ন কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক বা সংশয় এখনও সম্পূর্ণ নিরস্ত হয় নি।

ভাষার অজস্র প্রসাধনে ও বিচিত্র ছন্দোঝংকার সৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ ভাবকেও আশ্চর্যভাবে জনমনোরম করে তুলেছেন এবং এই কারুদক্ষতার দ্বারাই তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্যকে বর্তমানের খেয়া পার করে ভাবী কালের তীরে পৌছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের মতো জাত সভাকবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। তৎকালীন উচ্চাঙ্গের শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট অধিকারেরও প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্রের অনুবর্তনে তিনি একখানি বড় কাব্যও লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর 'কালিকামঙ্গল' (নামান্তর বিদ্যাসুন্দর) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' সঙ্গে তুলনীয় হবারও অধিকারী নয়। ভারতচন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি রচনায় মুক্তকণ্ঠ। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে নীরব ; তাঁর কৃতজ্ঞতা আন্তরিক, কৃতজ্ঞতাকে তিনি মুখরতার মধ্যে পর্যবসিত হতে দেন নি। তাঁর সমস্ত বাণীকে তিনি উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে।

কিন্তু যথার্থ কবিত্ব-সম্পদে এবং হৃদয় থেকে স্বতঃউৎসারিত সংগীত রচনায় রামপ্রসাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র তাঁর পাশেও দাঁড়াতে পারেন না। চণ্ডীদাসের সময় থেকে তিন শো বছর ধরে বাংলা দেশে যে অজস্র সংগীতের বন্যা বয়ে চলেছিল, ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে কোনো দিক্ দিয়েই রামপ্রসাদ তার অনুবর্তন করেন নি। বিষয়বস্তুতে প্রকাশ-ভঙ্গিতে ভাষায় ছন্দে অলংকারে তিনি সম্পূর্ণ নূতন এক ধারার প্রবর্তন করেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এসব বিষয়ে রামপ্রসাদ কোনো পূর্বগামীর অনুবর্তন করেছিলেন, এমন প্রমাণ নেই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখে রামপ্রসাদ তৃপ্ত হতে পারেন নি। গানেই যে তাঁর চরম কৃতার্থতা তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই লিখেছেন—

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি, গানে হব মত্ত।

তাঁর গ্রন্থ সত্য সত্যই গড়াগড়ি গিয়েছে। আর যে গানে তিনি মত্ত হয়েছিলেন, সে গানে সমস্ত দেশকেই তিনি মাতিয়েছেন। এই গানগুলি একাধারে কাব্য এবং ভক্তের আত্মনিবেদন। আসলে এগুলি হচ্ছে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে কবিসাধকের গীতাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদের ন্যায় এমন অপূর্ব গীতাঞ্জলি আর কেউ রচনা করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের সঙ্গেই রামপ্রসাদী গানের সাদৃশ্য বেশি, এবং সে সাদৃশ্য ভাবে ভাষায় ছন্দে এবং অনুভূতির গভীরতায় তথা প্রত্যক্ষতায়। রামপ্রসাদী গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগের হেতুও এখানেই। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, রামপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্যও তাঁদের কালগত ব্যবধানেরই সমানুপাতিক।

বৈষ্ণব কবিতা ভাবে ভাষায় ছন্দে অলংকারে সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ ও ব্রজবুলি সাহিত্যের পূর্বাগত ঐতিহ্যেরই অনুবৃত্তি। জয়দেব ও বিদ্যাপতির ন্যায় বিদগ্ধ কবির রচনাই ছিল বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ। লোকসাহিত্যের আদর্শ বৈষ্ণব কবিদের হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে রামপ্রসাদ সর্বতোভাবেই আশ্রয় করেছিলেন লোকসাহিত্যকে। তাঁর ন্যায় স্বভাবকবির পক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের গানের ভাষা চলতি বাংলা, সাধু পোশাকী বাংলাকে তিনি আশ্রয় করেন নি। আর তাঁর ছন্দও ছিল লোকসাহিত্যের ছন্দ, যাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কখনও 'বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' এবং কখনও 'রামপ্রসাদী ছন্দ' বলে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই চলতি বাংলা ও রামপ্রসাদী ছন্দ উভয়েরই অনুরাগী ছিলেন এবং গীতাঞ্জলির বহু রচনাতেই তিনি রামপ্রসাদী ভাষা ও ছন্দকেই মেনে নিয়েছেন, যদিও কিছু মার্জিতরূপে।

ভাষা এবং ছন্দ ছাড়া উপমা প্রভৃতি অলংকারের বেলাতেও রামপ্রসাদ বাংলা পল্লীগ্রামের জনজীবনে নিত্যদৃষ্ট বস্তুকেই আশ্রয় করতেন। বিশেষ করে এইজন্যও তাঁর গানের ভাব জনসাধারণের হৃদয়ে সোজাসুজি প্রবেশের পথ পেত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা বোঝা সহজ হবে।

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা॥

...

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত

এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা, শ্রীসূর্য বসিল পাটে,
নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে লায়,
দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ও মা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়,
সে কোথা পাবে গো॥

এই যে ফসলের খেত, কলুর ঘানির বলদ, গাঁয়ের হাট, খেয়া-নৌকো, পারানির কড়ি প্রভৃতি পল্লীজীবনের ঘরোয়া কথা ও আটপৌরে উপমার প্রয়োগ, এগুলিকে আশ্রয় করেই রামপ্রসাদের কবিত্ব ও জীবনতত্ত্ব অতি সহজভাবে সহজ ভাষায় বিকশিত হয়ে শ্রোতার হৃদয়মনকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতেও এসব নিত্যচেনা বস্তুকে উপমান করবার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

সুরের দিক্ থেকেও রামপ্রসাদী গানের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। রামপ্রসাদের অধিকাংশ গানই তাঁর নিজের উদ্ভাবিত একটি বিশেষ সুরে গাইতে হয়; এই সুর প্রায় দু শো বছর ধরে বাংলা দেশের নরনারীর কাছে 'রামপ্রসাদী সুর' নামে সুপরিচিত। সুরকার হিসাবে এটা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। বাংলা দেশে গানের কতকগুলি বিশিষ্ট সুর প্রচলিত আছে প্রাচীন কাল থেকে— কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর ইত্যাদি। এগুলি সবই এক-একটি শ্রেণীর পরিচায়ক, এবং কোনো ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত নয়। কিন্তু রামপ্রসাদী সুরে একাই একটি শ্রেণী এবং এই সুর উদ্ভাবনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই রামপ্রসাদের। আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সুরকারদের পূর্বে আর কেউ এমন কৃতিত্ব-গৌরবের অধিকারী নন, বোধ করি একমাত্র রামনিধি গুপ্ত ছাড়া।[১] এই সুর বাংলা দেশকে এমনই মুগ্ধ করেছে যে, পরবর্তী কালে বহু কবি এই সুরে গান রচনা করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও অনেক গান রামপ্রসাদী সুরে রচিত হয়েছে। এই সুরটিকেই বলা যায় রামপ্রসাদী গানের আত্মা। এই সুরটিকে বাদ দিলে তাঁর অনেক গানের প্রাণস্পন্দনটাই অনুভব করা যায় না।

১ এক কালে নিধুবাবুর টপ্পা যথেষ্ট খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত হয়েছে।

রামপ্রসাদের ভাব ভাষা অলংকার ছন্দ এবং সুর এমনই ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্যভাবে সমন্বিত যে, কোনোটিকেই অপরগুলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনাও করা যায় না। এই যে সর্বাঙ্গীণ সমগ্রতা, রামপ্রসাদী গানের অনন্যসুলভ জনপ্রিয়তার এটাই একটা মুখ্য হেতু।

রামপ্রসাদ শুধু সুরকার নন, সুগায়ক বলেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্বোদ্‌ভাবিত প্রসাদী সুর ছাড়া পূর্বাগত মার্গসংগীতের সুপরিচিত সুরেও তিনি অনেক গান রচনা করেছিলেন। যেমন—'নিতান্ত যাবে দিন'। সেগুলির গীতিগৌরবও কম নয়।

রামপ্রসাদী গানের ভাষা চলতি ও আটপৌরে, তার ছন্দ হাল্কা, অলংকার ঘরোয়া, সুর সহজ এবং বিষয়বস্তু নিত্য-চেনা। কিন্তু তা বলে তার অনুভূতি অগভীর নয় এবং চিন্তার সম্পদ্‌ও স্বল্পমূল্য নয়। ভাষা ও সুর সহ সমগ্রভাবে আয়ত্ত না করলে রামপ্রসাদী গানের গভীরতা অনুভব করা সম্ভব নয়। তবু দুএকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তার থেকেই কিছু পরিমাণে রামপ্রসাদী ভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করি।

কেবল আশার আশা ভবে আসা,
আসামাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে
ভ্রমর ভুলে র'ল ॥

...

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়াপাখি।
আমারি অন্তরে থেকে
আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥

...

ডুব দে রে মন কালী বলে,
হৃদি -রত্নাকরের অগাধ জলে।...
রাম -প্রসাদ বলে, ঝাঁপ দিলে মন,
মিলবে রতন ফলে ফলে ॥

...

নির্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল ;
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি ॥

...

মন গরীবের কি দোষ আছে ?
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
তারে যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥

বৈষ্ণব কবিতায় আদিরসের আতিশয্য অনেক স্থলেই তার কবিত্বমাধুর্য হরণ করে। কিন্তু রামপ্রসাদী গান মাতৃভক্তির গান, তাই এই গানে স্বভাবতঃই ওইজাতীয় ত্রুটির কোনো অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে মাতৃভক্তির গানে বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় ভাবের গভীরতার অবকাশ তো আছেই, বরং বেশি পরিমাণেই আছে ; আর তাতে দৃষ্টির উদারতা ও চিন্তাসম্পদের যে প্রাচুর্য দেখা যায়, বৈষ্ণব কবিতায় তার একান্তই অভাব। এ দিক্ থেকে রামপ্রসাদী গান রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতের সঙ্গেই তুলনীয়।

দুঃখ মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে রামপ্রসাদের জীবনদর্শনের মূল্য চিরন্তন এবং এ-রকম সহজ সরল অথচ গভীর দর্শনানুভূতির দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দাও দেখি তাই।...
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥

...

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে,
এই বাদানুবাদ করে সকলে।...
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই,
তাই হবি রে নিদানকালে ;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥

যিনি দুঃখকে ও মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর জীবনের মূল্যও সামান্য

নয়। রামপ্রসাদের স্বীকৃত জীবননীতি যে তৎকালের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল তার প্রমাণ আছে তাঁর রচনাতেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা সত্ত্বেও রামপ্রসাদের রচনায় কর্মপ্রেরণা তথা ইহজীবনের মূল্যস্বীকৃতির অভাবই দেখা যায়। অবশ্য এটা সে যুগের পক্ষে প্রত্যাশিতও নয়। তবে এই নূতন প্রেরণার জন্য বাংলাদেশকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। রামপ্রসাদের মৃত্যুর পরে অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই রামমোহনের জাদুস্পর্শে বাঙালির জাতীয় জীবনে নবপ্রাণের চাঞ্চল্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অনাগত জীবন-চাঞ্চল্যের আধ্যাত্মিক ভূমি যে কতকাংশে রামপ্রসাদের রচিত, তাতে সন্দেহ নেই।

রামপ্রসাদ আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার ইতিহাসে একটি পরম যুগসন্ধিক্ষণের প্রাক্‌কালে। রামপ্রসাদের মৃত্যু (১৭৮১) এবং রামমোহন রায়ের জন্ম (১৭৭২) প্রায় সমকালীন। পরবর্তী কালে রামমোহন যে ধর্মবিপ্লবের নেতৃত্ব করেছিলেন, তার অরুণাভাস দেখতে পাই রামপ্রসাদের রচনাতেই। কর্মের ক্ষেত্রে যে প্রেরণার অভাব দেখি রামপ্রসাদী গানে, ধর্মের ক্ষেত্রে সেই প্রেরণারই প্রাথমিক আবেগস্পন্দন অনুভব করি সেই গানেরই সুরে ও ছন্দে। সেই প্রেরণার মধ্যেই রয়েছে যুগান্তরের ও ধর্মবিপ্লবের পূর্বাভাস।

আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে,
পদে গয়া গঙ্গা কাশী॥

...

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী ?...
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি
পাবে কাশী দিবানিশি॥

পুণ্য বা মুক্তিলাভের আশায় তীর্থযাত্রার নিরর্থকতা সম্বন্ধে এই যে সরল ও স্বাভাবিক প্রত্যক্ষানুভূতি, এটাই ভাবী কালে বাংলার ধর্মচিন্তায় যুগান্তরের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল।

শুধু তীর্থযাত্রা নয়, মূর্তিপূজা সম্বন্ধেও রামপ্রসাদের মন ছিল মোহমুক্ত। তার নিদর্শন পাই বহু রচনায়।

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে ?
মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥...

অশিবনাশিনী কালী,
সে কি মাটি খড়-বিচালি ?
সে ঘুচাবে মনের কালি
প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না ?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন
করতে চাও তার উপাসনা।…
জগৎকে পালিছেন যে মা,
পশু পক্ষী কীট নানা।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ?
…
মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বস্ রে ধ্যানে ॥…
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥…
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি তোর বলিদানে ?
তুমি জয় কালী, জয় কালী, বলে
বলি দাও ষড়্ রিপুগণে ॥

এই যে মূর্তিপূজা পশুবলি প্রভৃতি স্থূল উপাসনার বিরুদ্ধে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির প্রকাশ, তা-ই মানুষের মনকে একটা নূতন আদর্শ ও নূতন চেতনার জন্যে উন্মুখ করে তুলেছিল। এই তো গেল ধর্মগত নেতির দিক্, এহ বাহ্যের দিক্। তার অয়মিতি বা সম্মতির দিক্ কোনটা তাও দেখা দরকার।

এবার আমি ভাল ভেবেছি,
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।···
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি
উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম
ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি॥

'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে', এই আদর্শকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করা তখনকার দিনে সত্যই অপ্রত্যাশিত। ভাবী যুগের অগ্রদূতের পক্ষেই এটা সম্ভব।

এসব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা,
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা।···
প্রসাদ বলে থাকো বসে
ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে,
ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥

রবীন্দ্রনাথ এভাবে কথা[১] বলেন নি। কিন্তু নটরাজের নৃত্যের তালের সঙ্গে তাল রক্ষার কথা আছে তাঁর বাণীতে। আর আছে—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে॥

বিশ্বজীবনের ছন্দের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ছন্দ যখন মিলে যায়, তখন 'ধর্মাধর্ম' বা 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা' কিছুই থাকে না, তখন সমস্ত জীবনযাত্রাটাই হয়ে ওঠে বিশ্বদেবতার আরাধনা। তাই রামপ্রসাদ বলেন—

শোন্ রে মন তোরে বলি,
ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান,
নিদ্রায় মাকে কর ধ্যান,

১ রবীন্দ্রনাথ কালীর কথাও বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। কিন্তু তার ভাবদ্যোতনা অন্যরকম। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ' প্রবন্ধ, 'দিব্যদর্শন' পত্রিকা ১৩৭৬ আশ্বিন।

ওরে নগরে ফির মনে কর
প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মা-রে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে,
ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর,
আহুতি দিই শ্যামা মা-রে ॥

অর্থাৎ রামপ্রসাদ জীবনকেই পূজারূপে গ্রহণ করেছিলেন। যিনি জীবনকে পূজার পর্যায়ে তুলতে পারেন তাঁকেই তো বলতে হয় সাধক। রামপ্রসাদের মধ্যেও তাঁর জীবন, ধর্ম ও গান এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে 'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনোই আমাদের ধর্ম হয়ে ওঠে না।···ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।··· প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। নটীর পূজা নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল, সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল, যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য; নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য নটী প্রমাণ করেছে।'

এই যে জীবন-পূজার আদর্শ, বাংলার বাউলদের মধ্যেও তার নিদর্শন আছে। তাদের মধ্যেও জীবন-রচনা গান-রচনা ও ধর্ম-সাধনা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। যথা—

যদি করিস মানা ওগো বন্ধু,
মানি এমন সাধ্য নাই।
কোনো ফুলের নামাজ রং-বাহারে,
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে,
আর বীণার নামাজ তারে তারে,
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই ॥

—শেখ মদন বাউল

রামপ্রসাদও আরাধ্য দেবতাকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর অন্তরের ভক্তি-উৎসারিত গানকে এবং সমস্ত জীবন দিয়ে এই সত্যেরই যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এই আত্মনিবেদনের শক্তিতেই তিনি শান্তচিত্তে দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে

পেরেছেন, বলতে পেরেছেন, 'আমি করি দুখের বড়াই', 'শমন কি ভয় দেখাও আমি'। এই আত্মনিবেদনের আবেগই তাঁর ভক্তি-সংগীতের উৎসধারায় উৎসারিত করেছে হৃদয়ের সত্য-উপলব্ধিকে।

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে,
মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ
তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরাম প্রসাদে রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে
তিমিরে তিমিরহরা॥

বিশ্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম-উপলব্ধি, মূর্তিপূজা ও বাহ্য অনুষ্ঠানের নিরর্থকতা প্রভৃতি যেসব তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাই রামপ্রসাদের রচনায়, তিনিই যে সেসবের প্রথম উদ্‌ভাবয়িতা তা নয়। আমাদের দেশের শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে সেগুলি দীর্ঘকাল ধরেই সুপরিচিত ছিল। রামপ্রসাদের কৃতিত্ব এই যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সেসব তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং দরদঢালা গানের ভাষায় ও সুরে ব্যাপকভাবে দেশের হৃদয়ের কাছে নিবেদন করেছিলেন। এই হিসাবে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবীর, রৈদাস, দাদূ, রজ্জব প্রমুখ সন্ত-সাধক[১] এবং লালন শাহ্ প্রমুখ বাংলার বাউলদের সমগোত্র। তাঁর গানকে আশ্রয় করে এসব

১ কবীর ও রৈদাস, দুইজনই ছিলেন কাশীর লোক এবং সমকালীন। আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতক। জাতিতে ও পেশায় কবীর ছিলেন জোলা (তাঁতী) আর রৈদাস ছিলেন চর্মকার। দাদূর (১৫৪৪-১৬০৩) সক্রিয় জীবন কেটেছিল আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫)।

নিত্যসত্য দেশের চিত্তে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ভাবী যুগের ভূমিকা রচনা করেছিল বলেই পরবর্তী কালে রামমোহনের শাস্ত্রাশ্রিত ধর্মের সংস্কার-প্রচেষ্টা অনেকাংশে সহজসাধ্য হয়েছিল। রামপ্রসাদের গানের কল্যাণে মানুষের মন সর্বময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার জন্যে বহু পরিমাণেই প্রস্তুত হয়েছিল। এই হিসাবে রামপ্রসাদকে রামমোহন-প্রবর্তিত আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যায়, যদিও তাঁর মনে ধর্মসংস্কারের কিছুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর আত্মগত সাধনসংস্কারই রামমোহনের সমষ্টিগত ধর্মসংস্কারের আনুকূল্য করেছিল।

কবীর-দাদূ প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তসাধক এবং লালন শাহ্ প্রমুখ উত্তরকালীন বাঙালি সাধকদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে রামপ্রসাদের গুরুতর পার্থক্য ছিল। এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। কবীর প্রমুখ অবাঙালি সাধকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে শুধু লালন শাহের রচনা থেকে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়াই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা দেখেছি রামপ্রসাদের মতে যথার্থ সত্যোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধির পক্ষে কাশী প্রভৃতি তীর্থে যাওয়া বা দেবতার মূর্তি গড়িয়ে ও নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা-অর্চনা করা নিরর্থক। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়েই পরমদেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাউল সাধকদের সাধনপদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য নেই। লালনের গান থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্‌ধৃত করলেই তা স্পষ্ট হবে। উদ্‌ধৃতিগুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থে (১৯৫৮) প্রযুক্ত ক্রমিক সংখ্যাসূচক।

কাশী কি মক্কায় যাবি যে মন, চল্ রে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যে বেলায় উপায় নাই॥
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশীস্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই॥
নৈবিদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা,

সামাজিক পরিচয়ে মুসলমান ধুনুরি। জীবনের অধিকাংশ কাল কাটে রাজস্থানে। মৃত্যু জয়পুরের নিকটস্থ 'নরানা' নামক স্থানে। দাদূর প্রধান শিষ্য রজ্জব ছিলেন জাতিতে পাঠান; তাঁরও কর্মজীবন কাটে মুখ্যতঃ রাজস্থানে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে। জন্মমৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত

সিন্নি বেলায় দরগা-তলা
তাও দেখে মন খলবলায় ॥
চুল পেকে হলে বুড়ো,
না পেলে পথের মুড়ো ;
লালন বলে, সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই ॥ ১০

যেতে সাধ হয় রে কাশী, কর্ম-ফাঁসি বাধে গলায়।
আমি আর কত দিন ঘুরবো এমন নাগর-দোলায় ॥ ১১

আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত
বাড়বে তত
লখনা ॥ ৪

'কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়' (৫০), এই প্রশ্নের উত্তরে লালন বলেন— 'পঞ্চতত্ত্ব সাধন ক'রে' (অর্থাৎ শক্তি-সাধনায়) যদি পরমার্থ লাভ হত তবে বৈষ্ণবেরা কেন ফোঁটা-তিলক টেনে 'কুলের বাহির হয় সেই চরণ-বাঞ্ছায়'? আবার বৈষ্ণব সাধনাই যদি সিদ্ধিলাভ হত তবে ব্রহ্মজ্ঞানীরাই কেন বলে থাকেন— 'শাক্ত-বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয়'? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে শাক্ত-বৈষ্ণবরাও আত্মজ্ঞানের তথা মূলসত্যের সন্ধান পান নি। পক্ষান্তরে দরবেশদের অর্থাৎ বাউলদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানেও সত্যোপলব্ধি হয় না। সবশেষে লালন বলেন— দরবেশী প্রণালীতেই অধরাকে ধরা যায়। বাউল সাধকদের মতে সব সাধনার সেই অভীষ্ট পরম রয়েছেন নিজের মধ্যেই— বাইরের জগতে তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। 'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে' (১৩), 'কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়' (৪৩), 'আছে যার মনের মানুষ মনে, সে কি জপে মালা' (৭), এ-রকম বহু উক্তির মধ্যেই বাউল-সাধনার মূলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বজগতের পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষের মনে। বাউল সাধকরা মানুষের মনে প্রকাশিত সেই পরম সত্তার পরিচয় দিয়েছেন মনের মানুষ, ভাবের মানুষ, অধর মানুষ, অধর, সাঁই, নিরঞ্জন ইত্যাদি নানা অভিধায়। এগুলির মধ্যে 'মানুষ' অভিধাটিই প্রধান। এ প্রসঙ্গে

স্মরণীয় 'মানুষ অবিশ্বাসে পাই নে রে সে মানুষ-নিধি'[1], সর্ব-উত্তম মানুষলীলা' (৩৮৭), 'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই, শুনি মানবের উত্তর কিছুই নাই' (৪১৪), ইত্যাদি নানা বাণী। এই উদ্ধৃতি-দুটি অনিবার্যরূপেই স্মরণ করিয়ে দেয় 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এই বহুপ্রচলিত সুভাষিতটি। এই সুভাষিত বাণী যাঁর রচনাই হক এটি যে মূলতঃ বাউলতত্ত্বের সার নিষ্কর্ষ এবং আধুনিক অর্থে গৃহীতব্য নয় তাতে বোধ করি সন্দেহ করা চলে না। যা হক, বাউল গানে মানুষ, সাঁই ইত্যাদি অভিধার সঙ্গে সঙ্গে আল্লা, খোদা, হরি, ঈশ্বর প্রভৃতি নামের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন— 'ডাক রে মন আমার হক নাম আল্লা বলে', (৪৬২), 'রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময়' (৪২০), 'জাত না গেলে পাই নে হরি' (৪৪৬)। বাউল সাধনায় বৈদিক এবং বৈষ্ণব শাক্ত শৈব প্রভৃতি সব উপসাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও পূজাযজ্ঞাদি ধর্মাচার সবই সমভাবে অগ্রাহ্য। কারণ তাঁদের বিচারে এই সব মতই ভ্রান্ত, আর ও-রকম সব ধর্মাচরণই নিরর্থক। এসবের দ্বারা মনের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, বাউল সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মাগত বা সামাজিক পার্থক্যও স্বীকৃত হয় না।[2] যেমন—

> ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
> হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই॥ ৫৩
> ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে ?
> হিন্দু মুসলমান দুইজন দুই ভাগে॥ ৫৯

লালন ফকিরের এসব উক্তিতেই বাউল সাধনার অসাম্প্রদায়িক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, লালন প্রমুখ বাউল সাধকরা হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন জাত-বিচারেরও বিরোধী।—

১ স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের উক্তি— 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' রবীন্দ্র স্বীকৃত 'মানুষের ধর্ম'ও বহুলাংশে বাউলতত্ত্বাশ্রিত, এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

২ এ বিষয়ে উত্তরভারতীয় সন্তসাধকদের সঙ্গে বাংলার উত্তরকালীন বাউলদের আদর্শগত সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বভাবতঃই মনে আসে দাদুর উক্তি— 'সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।' মনে হয় লালন প্রমুখ বাউলরা সন্ত-সাধকদের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ উভয়ের ভাবে ও ভাষায় প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় কবীর-দাদুর রচনাতেও সাঁই (অর্থাৎ স্বামী, ঈশ্বর) অধর প্রভৃতি অভিধার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে ॥···
ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান ?
বামুন চিনি, পৈতেয় প্রমাণ—
বামনী চিনি কি প্রকারে?৫৪

সাধক কবীর জাতিতে ছিলেন জোলা, আর রামদাস (রৈদাস) ছিলেন মুচি; তথাপি তাঁরা সাধনবলে সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।— লালনের গানে বারবার এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, লালন ফকির শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তার অন্যতম প্রধান কারণ ওই আদর্শে ব্রতপূজা, আচার-অনুষ্ঠান এবং জাতিবিচার পরিত্যাগ।—

গোরা কি আইন আনিল দুনিয়ায়।···
আলগা আচার আলগা বিচার, দেখে শুনে লাগে ভয়।
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাই তাতে, প্রেমের গুণ গায় ॥
জেতের বোল রাখলো না সে তো, করলো একাকারময় ॥ ৩১২

কোন্ প্রেমের দায়ে গৌর পাগল,
পাগল করলে নদের সকল!
রাখলো না কারো জেতের বোল, একাকার করলে সেথা ॥৩১৪

এ দিক্ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রদায়ের আদর্শগত ঐক্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের চিত্তও এই আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু রামপ্রসাদ এতদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। হয়তো নানা ঐতিহাসিক কারণে তা সম্ভবও ছিল না। রামপ্রসাদ আসলে ছিলেন সগুণ ব্রহ্মবাদী। এ বিষয়ে তাঁকে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রহ্মবাদের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু ব্রহ্মবাদী হলেও রামপ্রসাদ বাহ্যতঃ তান্ত্রিক মতে শাক্ত উপাসনাপদ্ধতি বর্জন করেন নি। তা ছাড়া, রামপ্রসাদ পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল বলে মনে হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছাড়া অন্য যেসব ধর্মসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় সেকালে বাংলাদেশে প্রচলিত

ছিল সেগুলির মধ্যে শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়, যথেষ্ট বিরুদ্ধতাও ছিল,— যদিও তা নানা ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে আসছিল। রামপ্রসাদ সেই উপসাম্প্রদায়িক ধর্মগুলিকে একটা গভীরতর আধ্যাত্মিক ঐক্যভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে বাইরের বিচ্ছিন্নতা ও বিরুদ্ধতাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। উত্তরকালে রামপ্রসাদী গান সমগ্র দেশের চিত্তে যে সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাতেই তাঁর ঐক্যসাধন প্রয়াসের সাফল্য সপ্রমাণ হয়। এই ঐক্যসাধনপ্রয়াসের নিদর্শন হিসাবে রামপ্রসাদের একটি গানের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করছি।—

মন, করো না দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করলাম কত খোঁজতালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশি।
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

...

প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

'মন, করো না দ্বেষাদ্বেষি', এই উক্তির দ্বারাই বোঝা যায় রামপ্রসাদের সময়েও হিন্দু সমাজে উপসাম্প্রদায়িক ধর্মকলহের অভাব ছিল না। রামপ্রসাদ ছিলেন তার ঊর্ধ্বে। কিন্তু তিনি ধর্মগুরুর আসন গ্রহণ করে কলহপরায়ণদের প্রতি কোনো উপদেশ-বাণী উচ্চারণ করেন নি। নিজের মনকেই জানালেন কলহবিবাদ বর্জনের অনুরোধ। এই আশ্চর্য বিনম্র পদ্ধতিই তাঁর ধর্মসমন্বয় সাধনের প্রয়াসকে এমনভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। মধ্যযুগের কোনো ধর্মসাধক এর চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। মোট কথা, এই গানগুলির দ্বারাই রামপ্রসাদ তৎকালীন ধর্মগত ভেদবিরোধকে অনেক পরিমাণে নিরস্ত করে আমাদের জাতীয় চিত্তকে একটি সুগভীর আত্মিক ঐক্য দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই হিসাবে রামপ্রসাদকে বাংলার প্রথম জাতীয় কবি বলে অভিহিত করলে বোধ করি ঐতিহাসিক সত্য লজ্জিত হবে না। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি কোনো কালে একটা জাতিকে

গড়ে তোলার কাজে এতখানি সফল হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। অন্ততঃ বাংলাদেশে যে হয় নি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবে রামপ্রসাদ যদি সেকালেই হিন্দুর জাতিভেদ তুলে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউলদের ন্যায় সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেও ঐক্যস্থাপনে প্রয়াসী হতেন তা হলে বোধ করি ঐতিহাসিক কারণে তাঁর ভাগ্যে ব্যর্থতাই জুটত। ফলে তাঁর আত্মিক ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসও হত নিষ্ফল। পরবর্তী উনবিংশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে হিন্দুসমাজের ভেদবিরোধ মেটানোই এমন দুঃসাধ্য সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ঐক্যস্থাপন তো অকল্পনীয়, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতকে। মনে রাখতে হবে উক্তপ্রকার সামাজিক একতাস্থাপন প্রয়াসে নানক কবীর দাদূ রজ্জব প্রমুখ মধ্যযুগের সাধকদেরও ব্যর্থতাই স্বীকার করতে হয়েছিল। বাংলাদেশের বাউল সাধকরাও সফল হন নি। তবে এ কথাও মানতে হবে যে, মহৎ প্রয়াস নিষ্ফল হলেও তার গৌরবহানি হয় না, তার শক্তিও চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় না।

রামপ্রসাদ তাঁর নিবাচিত ক্ষেত্রে মহৎ সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন। মহত্তর ব্রতে ব্রতী হয়ে তাঁকে গৌরবময় ব্যর্থতা বরণ করতে হয় নি। তবে তিনি তাঁর সীমিত সাফল্যের দ্বারা ভাবী কালের বৃহত্তর সাফল্যের পথ রচনা করে রেখেছিলেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আর-এক হিসাবেও রামপ্রসাদকে ভাবী যুগের অগ্রদূত বলা যায়। তিনি শুধু সাধক ছিলেন না, তিনি কবিও ছিলেন। তাঁর রচনায় বহু স্থানেই খুব উঁচু স্তরের কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কবিত্বের বিচারেও শাক্তসাধক রামপ্রসাদকে বাংলার বাউল-সাধকদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। আধুনিক কালে গীতিকবিতার যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে, তারই পূর্বাভাস পাই রামপ্রসাদের গীতাবলীতে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অবশ্য গীতিকবিতার ভাব ও রূপ খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ওই গীতিকবিতায় কবিহৃদয়ের অনুভূতি প্রত্যক্ষ প্রকাশের সুযোগ পায় নি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সে অনুভূতি ছিল প্রচ্ছন্ন, তার বৈচিত্র্যবিকাশের পথও ছিল অবরুদ্ধ। রামপ্রসাদের গানেই কবিচিত্তের প্রত্যক্ষ প্রকাশের প্রথম পরিচয় পাই। তাতে কবির বেদনাকে পরের জবানিতে প্রকাশ করা হয় নি এবং তাকে গতানুগতিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে স্বচ্ছন্দভাবে ও বহু বিচিত্র

রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রগত বা সাহিত্যিক ঐতিহ্যগত কোনো বন্ধন তাতে নেই। রামপ্রসাদের গানে কবির মুক্ত হৃদয়ের মুক্ত প্রকাশ ঘটেছে বন্ধনহীন স্বচ্ছন্দ গতিতে। আর, ভাব ভাষা এবং ছন্দের মুক্ত গতিও আনুকূল্য করেছে কবির মুক্ত মনের বিকাশকে।

বাংলার গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ, এই তিন মহাগীতিকবির মধ্যে। তার মধ্যে কালের দিক্ থেকে যেমন, কবির ভাব চিন্তা ও প্রকাশ-গত বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকেও তেমনি, রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসের চেয়ে রবীন্দ্রনাথেরই নিকটতর। আধুনিক কালের আদর্শে যাকে বলা যায় যথার্থ লিরিক বা গীতিকবিতা, বাংলা ভাষায় রামপ্রসাদকেই তার প্রথম প্রবর্তক বলে স্বীকার করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গৌরবের আসনেই তাঁর স্থান।

অনুষঙ্গ

বাউল গান

আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল-পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি।[১] শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত।[২] আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,[৩] শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল—

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১২৯০ বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত এবং 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে (১৩৭৩ বৈশাখ) সংকলিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'বাউলের গান'।

২ উক্ত 'বাউলের গান' প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ শিলাইদহে বাউল-দলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার পূর্ববর্তী।

৩ তখনও শিলাইদহের বাউল-দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় নি বলেই মনে হয়।

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।...এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না,— তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, ভালোমন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো, অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তার পরে একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়।...অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে।...এইজন্যে যেসব বাউলের গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কী সাধনার, কী সাহিত্যের দিক্ থেকে তার দাম বেশি নয়।[১]

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে-একটি বড়ো আন্দোলন জেগেছিল, সেটি মুসলমান-অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এল, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক, অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে।...এই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশই কমে আসছিল, কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ করে নিয়েছিল। সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হয়ে উঠলুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান, সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই

---

১ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'অচিন ডাকে নদীর বাঁকে' ইত্যাদি বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৬), পৃ ১৮৩-৮৪।

সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্যপ্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।... যেসব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেইসব চিত্তে, সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে।...রামানন্দ কবীর দাদূ রবিদাস নানক প্রভৃতির চরিতে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

...আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই।...এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধে নি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়। বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলাদেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের আগাচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন মহাশয় বাউল-সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্‌যোগ করেছেন আমি তার অভিনন্দন করি— সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে। পৌষসংক্রান্তি ১৩৩৪ *

প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র, পৃ ৭৪৪-৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* মহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকা— রবীন্দ্রনাথের 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে সংকলিত।

বাংলা সাহিত্যে জনজীবন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গৌরবে আমাদের গর্বের সীমা নেই। রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন—

বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব ;
জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।

এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করে দেখা যেতে পারে দু দিক্ থেকে। এক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি ও তার সত্য মূল্য কতখানি। দুই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় পূর্ববর্তী সাহিত্যের মূল্যই বা কতখানি এবং তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি কি না। একে একে বিচার করে দেখা যাক।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য শুধু শিক্ষিত সমাজেরই সাহিত্য। আমাদের চিরাগত জনসমাজের অতি অগভীর উপরের স্তরেই তার উদ্ভব ও বিকাশ। জাতীয় জীবনের গভীরতায় মূল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ও সেখান থেকে সঞ্জীবন-রস সংগ্রহ করে কালজয়ী শক্তি অর্জনের সুযোগ সে পায় নি, এখনও পাচ্ছে না। অনেকটা কৃত্রিম টবে সযত্নলালিত চারাগাছের পুষ্পসৌরভের মতোই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই গৌরব। তার আয়ুষ্কালও কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী মাত্র। সুদীর্ঘ ভাবী কালের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় এর সমস্ত কৃত্রিমতার খাদ ছাই হয়ে গিয়ে খাঁটি সোনা অবশিষ্ট থাকবে সামান্যই। ইংরেজি শিক্ষা যেমন আমাদের জাতীয় জীবনকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে, আমাদের অতি গর্বের বাংলা সাহিত্যও কি তাই করে নি ? বিপুল জনসমাজ আমাদের এই সাহিত্যিক ভোজসভায় অনাহূত ও অনাদৃত। তারা বহুকাল এই ভোজসভার দেউড়ির বাইরে হতাশ ও বুভুক্ষু-হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছে। স্বাধীন দেশেও এই বিসদৃশ অবস্থা পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই অবাস্তব ইংরেজি শিক্ষা ও কৃত্রিম সাহিত্যের ডিঙি বেয়ে আমরা ইতিহাসের সাগর পার হতে পারব না। তার প্রবলতম বাধা আমাদের উপেক্ষিত এই অগণিত জনসমাজ। কেননা কবির কথায়—

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।…

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হতে পারে না। 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।' কালচক্রের আবর্তনে অবহেলিতেরও অভ্যুত্থান ঘটে। আমরা সাহিত্যগর্বিতরা এই সত্যকে আজও উপেক্ষা করেই চলছি। একদিন না একদিন তার মাশুল মেটাতে হবেই। কালের প্রভাবে শিক্ষাশক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে ও স্ববলে সিংহদ্বার ভেঙে এই অবজ্ঞাত জনসমাজ একদিন যখন বাংলা সাহিত্যের রাজ্যপাট অধিকার করে বসবে তখন যে এই সাহিত্যের বর্তমান চেহারা সম্পূর্ণ পাল্‌টে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তখন অবশ্য তাকে গঙ্গা বা পদ্মার জলে বিসর্জন দেওয়া হবে না, তখন তাকে ইতিহাসের জাদুঘরে গৌরবের আসনেই সযত্নে অধিষ্ঠিত করে রাখা হবে। ভাবী কালের সর্বজনীন বাংলা সাহিত্য হবে সজীব, সচল, অনতিকৃত ও জাতীয় জীবনরসে নিত্যপ্রবর্ধমান। তখনকার দেশব্যাপী পাঠকের অন্তরে বর্তমান কালের আমদানি-করা উপাদানে অতিপ্রসাধিত ও সংস্কৃতিবিলাসী নাগরিকের কক্ষচারী বাংলাসাহিত্যের উজ্জ্বলতা বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগাতে পারে, কিন্তু মমতামাখা প্রীতি জাগাতে পারবে কি না সন্দেহ। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে (১৯৪১) এসে রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের রচনাও 'গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী'। এই সর্বত্রগামিতার লক্ষ্য তাঁর স্বদেশেরই উপেক্ষিত বিপুল জনসমাজ। তাই তিনি বললেন—

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগযুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

এই বিপুল জনতা সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। অতি অল্প বয়সে তিনি যখন ধনীর দুয়ারে উপেক্ষিত কাঙালিনী মেয়ের অন্তরের বেদনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন তখন থেকে সারাজীবনই তিনি এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দেবার ও তাদের অন্তরে আশা সঞ্চারের সাধনা করে গেছেন সাহিত্যে ও কর্মে। কিন্তু এ সাধনা বাইরের সাধনা, এ উপলব্ধি পরোক্ষ উপলব্ধি।

দূর থেকেই তিনি তাদের জীবনকে দেখেছেন, তাদের হৃদয়ের প্রতিস্পন্দন অনুভব করেছেন। তাদের সঙ্গে একাত্মতা-স্থাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাদের অন্তরে প্রবেশ করবার সাধ্যও তাঁর ছিল না। কেননা—

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার ;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।...
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে সংকীর্ণ বাতায়ন থেকে তিনি যা দেখেছেন অন্যরা তাও দেখেন না, আর যে সম্মানের নির্বাসন-বেদনা তিনি অনুভব করে গেছেন সে বেদনার আভাসমাত্রও অন্যত্র দেখা যায় না। এই চারটি ছত্রে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তার নিহিতার্থ টুকু আরও একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেও দেখি না (কেননা দেখতে চাই না) যে, আমাদের বর্তমান বাংলাসাহিত্য ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কুলীন কায়স্থদের সৃষ্টি মাত্র, আর কারও হাত তাতে লাগে নি বললেই হয়। এই তিন জাতি একত্র মিলেও সমগ্র বাঙালি সমাজের 'অতি ক্ষুদ্র অংশ' বই কিছু নয়, অথচ তারাই সমাজের উচ্চমঞ্চ অধিকার করে বসেছেন এবং সেখান থেকে সংকীর্ণ বাতায়ন-পথে কখনও কখনও নিম্নস্তরচারী জনতাজীবনের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রার বেড়াগুলি যে তাঁদেরই অখণ্ড জাতীয় জীবনের উদার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মানের সংকীর্ণতার গণ্ডীতে নির্বাসিত ও অবরুদ্ধ করে রেখেছে সে চেতনা এখনও হয় নি। এই সম্মানিত ও অবরুদ্ধ জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্যে। কিন্তু সাহিত্য-মন্দিরের বহিরঙ্গনে দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে হিন্দু সমাজের অধিকাংশ এবং বিপুল মুসলমান বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সমাজের প্রায় সমগ্র অংশ। যতদিন না আমাদের সাহিত্যের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে ততদিন বাঙালিজীবনের অকৃতার্থতাও ঘুচবে না, বাংলাসাহিত্যও কৃত্রিমতার কলঙ্কমুক্ত হবে না। বাংলাসাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সবাইকে ডেকে বলার সময় এসেছে—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।

রবীন্দ্রনাথ এই সর্বজনীন সাহিত্যের অভাব বোধ করে গেছেন এবং তাঁর নিজের পক্ষে যা করা সম্ভব হয় নি তার আহ্বানও জানিয়ে গেছেন—

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি নি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

বেশ কিছুকাল থেকেই আমরা আবার সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেই জনসাহিত্য রচনার বিলাসে অভ্যস্ত হয়েছি। আমরা এখন রাজধানীর ড্রইং রুমে বসে পল্লীসংগীত চর্চা করি আর লোকসংস্কৃতির রসগ্রাহিতাকে আভিজাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য করি। জনসমাজ থেকে সযত্নে নিরাপদ্ ব্যবধান রক্ষা করে তাদের দুঃখবেদনাময় জীবন নিয়ে সংস্কৃতিসম্ভোগের বিলাস বা উচ্চকণ্ঠে সমবেদনা প্রকাশ গুরুতর অপরাধ, তার এক দিকে আছে আত্মবঞ্চনা আর অপর দিকে প্রতারণা। ভবিষ্যতের ইতিহাস এজন্য আমাদের ক্ষমা করবে না। প্রকৃত জনসাহিত্য রচনার উদ্‌যোগপর্বে চাই দেশব্যাপী জনশিক্ষার আয়োজন। শিক্ষিত জনতার মধ্য থেকেই উদ্‌ভূত হবে যথার্থ জনসাহিত্যিক। তখন এক দিকে যেমন অভিজাত শিষ্ট সমাজ ও অনভিজাত প্রাকৃত সমাজের ভেদরেখা ঘুচে যাবে, তেমনি শিষ্ট সাহিত্য ও প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আর শিষ্ট সমাজে জনসংস্কৃতিসম্ভোগ-বিলাসের অবকাশ থাকবে না। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভাবী কালের কাছে বেদনার্ত আবেদন জানাতে হবে—

এস, কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক্ মনের
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

এবার অধুনাপূর্ব বাংলা সাহিত্যের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। এ কথা প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তুলনায় আমাদের পূর্বতন সাহিত্য নিতান্তই অনুজ্জ্বল। জগৎ-কবিসভায় দূরে থাক, ভারত-কবিসভায় যাঁকে নিয়ে গর্ব করা যায়, সে যুগের এমন ক'জন কবির নাম

করতে পারি? ভারতচন্দ্রকে বঙ্গচন্দ্র বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁকে যথার্থতঃ 'ভারতচন্দ্র' বললে অতিকৃতি দোষ ঘটবে নাকি? তুলসীদাসের সঙ্গে তুলনা করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বস্তুতঃ তুলসীদাসের পাশে কৃত্তিবাস-কাশীরামকেও হীনপ্রভ বলেই স্বীকার করতে হয়। আসল কথা এই যে, তখনকার দীর্ঘকালব্যাপী নৈশ সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কখনও দেখা যায় নি বলাই সংগত। রবির প্রসঙ্গ তো তোলাই অকল্পনীয়। সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যের কথা স্মরণ করলেই আমাদের প্রাকৃতন বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশার কথা বোঝা সহজ হবে। শেক্স্পীয়র-প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কবিদের কথা ছেড়ে দিলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজ কবির সমকক্ষ ক'জন মধ্যকালীন বাঙালি কবির নাম আমরা করতে পারি? এই আপেক্ষিক দৈন্যের ঐতিহাসিক কারণ অবশ্যই আছে এবং তা নিয়ে বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। কিন্তু এ স্থলে সে আলোচনা অনাবশ্যক। আমাদের পক্ষে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তখনকার দিনে ত্রিবিধ শিক্ষা চলত তিনটি স্বতন্ত্র ধারায়— ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলা, যথাক্রমে মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠী ও পাঠশালায়। এই ত্রিবিধ শিক্ষার সমবায় দেখা যেত খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে ভারতচন্দ্র ও রামমোহনের নাম স্মরণীয়। তা ছাড়া শিক্ষার মানও ছিল সমকালীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার তুলনায় অতি নিম্নস্তরের। শিক্ষার এই খণ্ডিত প্রকৃতি ও অবনত মানই হল সেকালের বাংলা সাহিত্যের পঙ্গুতা ও অনুজ্জ্বলতার মূল কারণ। আধুনিক কালে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার প্রকৃতি ও পূর্ণতার দ্বারাই সাহিত্যের প্রকৃতি ও পূর্ণতা নিয়ন্ত্রিত হয়, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। বাংলাদেশের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

সে কালের বাংলায় ত্রয়ী বিদ্যার এবং ত্রিবেদীদের সংখ্যাল্পতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিবেদীর সংখ্যা এত কম ছিল না। সংস্কৃত ও বাংলা বিদ্যার সমবায় ঘটত কিছু বেশি, ফলে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিছু পরিমাণে যোগরক্ষা করা চলত। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু ফারসি ও বাংলা বিদ্যার সমন্বয় প্রায় ঘটত না বলেই সমকালীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগরক্ষা সম্ভব হত না, ফলে তৎকালীন বাংলার মনোজীবনে ও সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল এক প্রকার

শক্তিক্ষয়ী সংকীর্ণতা বা কূপমণ্ডূকতা। কিন্তু সংস্কৃত বা ফারসি বিদ্যার অতি-প্রাধান্য বাঙালির জাতীয় জীবনে বিক্ষিপ্ততা আনতে পারে নি। সংস্কৃত জানা ও না-জানা এবং ফারসি জানা ও না-জানা মানুষের মধ্যে বড় রকম ব্যবধান দেখা দিতে পারে নি, যেমন দিয়েছে আধুনিক কালে ইংরেজি জানা ও না-জানাদের মধ্যে। ফলে বাংলা সাহিত্যই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উপরের ও নীচের স্তরের মধ্যে নিরন্তর যোগ রক্ষা করত। এই সাহিত্যিক যোগ ইতিহাসের সব পর্বেই ছিল অবিরত ও অব্যাহত। এ কথা সত্য যে, তখনও শিষ্টজন-রচিত সাহিত্যের পাশে পাশেই প্রাকৃতজন-রচিত একটি লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত ছিল। কিন্তু এই দুই ধারার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল না। উভয়েরই উদ্ভব ও লালনক্ষেত্র ছিল বাংলার পল্লীগ্রাম। শহর ও গ্রামের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক, উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানও ছিল অবারিত। আধুনিক কালের মতো শহুরে সংস্কৃতি ও পল্লীসংস্কৃতির জাতিগোত্রগত পার্থক্য তখন ছিল অভাবনীয়। তা ছাড়া শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বা ছোট-বড়র আদান-প্রদানও ছিল নিত্যসক্রিয় ও সর্বস্বীকৃত। তাই দেখি এক কালে যা নেহাত লোকজীবনের কাহিনী মাত্র, অন্য কালে তা-ই উন্নীত হয়েছে শিষ্টজনগ্রাহ্য সাহিত্যে। যেমন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি। অন্য দিকে দেখি শিষ্ট জনেরাও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবস্তুকে প্রাকৃতজনসংবেদ্য রূপে উপস্থাপিত করতে নিত্যতৎপর। যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি। আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে-কালে দেশের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে বৈষয়িক যোগাযোগ রক্ষা ছিল দুঃসাধ্য, সে-কালেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে চিত্তসংযোগের ক্রিয়া চলছিল অবলীলাক্রমে। তাই একই জনবাদ বা সাহিত্য-কাহিনী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগত না। এই চিত্ত-সংযোগই নানা দুর্যোগ-দুর্দিনের মধ্যেও বাংলার জনসংযোগকে নিত্যবর্ধমান করে রেখেছিল। বাংলার সর্বত্রসঞ্চারী নদীপ্রবাহগুলি যেন দেহের শিরাধমনীর মতোই দেশের সর্ব প্রান্তে শ্রী ও সমৃদ্ধি যুগিয়ে বাঙালিকে একই জীবনবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, আর তাতেই তার বহির্জীবনে দেখা দিয়েছে সুসমঞ্জস ব্যাবহারিক ঐক্য। নানা ধারায় প্রবাহিত মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্যও তেমনি বাঙালির চিত্তভূমির সর্বাংশে শক্তি ও পুষ্টি যুগিয়ে তাকে একই চেতনাবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল, আর তাতেই তার অন্তর্জীবনে গড়ে উঠেছিল সুষমাময় সাংস্কৃতিক ঐক্য। প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, এই উভয়ের সমন্বিত ক্রিয়াফলে

আধুনিক যুগের প্রত্যূষপর্বেই অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তার অভ্যুদয় ঘটেছিল। এটাই পূর্বতন বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব ও প্রধান কীর্তি। সে সাহিত্য বাঙালির চেতনাকে শহরে-গ্রামে উপরে-নীচে শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে বিচ্ছিন্ন করে নি; সমগ্র জাতিকে এককেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট করাই ছিল সে সাহিত্যের প্রধান কাজ। সে কাজে সকলেরই হাত লেগেছিল। এই সাহিত্যিক ভোজে হিন্দু-মুসলমানের ভেদও মানা হত না। কি রামায়ণ-মহাভারত, কি বৈষ্ণব শাক্ত বা বাউল পদাবলী, কোথাও মুসলমানের দানগ্রহণে কোনো কার্পণ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই তার সাক্ষী। সে ইতিহাসের সাক্ষ্যগ্রহণ বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের অভিপ্রেত নয়। রামায়ণ-মহাভারত রচনায় মুসলমানের আগ্রহ-উৎসাহের অভাব ছিল না, এ কথা কে না জানে? মুসলমান-রচিত বৈষ্ণব পদাবলী যে হিন্দুর অপাঠ্য ও অগেয় ছিল না তার প্রমাণ পদাবলী-সংগ্রহ। শাক্ত সংগীত রচনা যে মুসলমানের পক্ষে অবৈধ বলে গণ্য হত না তার নিদর্শনও বিরল নয়। তবে সব চেয়ে উদার ছিল বাউল সম্প্রদায়। তাদের রচনাতেই বাংলা সাহিত্যের ও মননসংস্কৃতির সমন্বয়ক্রিয়া চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। হিন্দুই হক আর মুসলমানই হক, কারও পক্ষেই এ সম্প্রদায়ের দ্বার রুদ্ধ ছিল না। বাউল-সাহিত্য তাদের উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বাউল-সাধক লালন ফকিরের ভাবজগতে শুধু বৈষ্ণব শৈব শাক্ত নয়, তার সঙ্গে ঐসলামিক সাধনাও একাকার হয়ে মিশে গিয়ে একই বিশ্বতত্ত্বের সাধনায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর পদাবলীর প্রায় সর্বত্রই এই সমন্বিত সাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে লালন ফকিরের জীবন-কাল (১৭৭৪-১৮৯০)[১] রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগসেতুরূপে বিরাজ-মান ছিল। অপর দিকে দেখা যায়, রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ও রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) উভয়ের আয়ুষ্কাল ছিল তাঁর জীবনকালের পরিধিভুক্ত। একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, এই তিন জনের স্বীকৃত সাধনতত্ত্ব ও লালন-স্বীকৃত সাধনতত্ত্ব মূলতঃ অভিন্ন। কিন্তু লালন তো কখনও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার আওতায় আসেন নি। তিনি চিরাগত খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতিরই আধুনিক প্রতিভূ। অথচ তাঁর গানের বাণী কি করে অশিক্ষিত

১ দ্রষ্টব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থ (১৯৫৮), শশিভূষণ দাশগুপ্ত-লিখিত 'ভূমিকা', পৃ ৫।

প্রাকৃতজন ও রবীন্দ্রনাথের মত শিষ্টজনের হৃদয়কে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে সেটাই চিন্তনীয়। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এ কথা অনেকাংশে খাটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, লালনের বাণী যেভাবে সমস্ত ভেদবিচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে শিক্ষিত-অশিক্ষিতকে একত্র আকৃষ্ট ও সংহত করেছে, আমাদের পূর্বতন বাংলা সাহিত্য প্রতিনিয়তই সেভাবে বাঙালি জাতিকে একত্র সংবদ্ধ করেছে। মোট কথা এই যে, বাঙালি যে আজ নানা খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এক অখণ্ড জাতীয়তার অধিকারী হতে পেরেছে তা মুখ্যতঃ আমাদের বিগতকালীন বাংলাসাহিত্যেরই দান। আর, যে সাহিত্য জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তরকে একতা ও সমন্বয় দান করে তাকেই বলে জাতীয় সাহিত্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এই দুর্লভ গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, আর এটাই তার প্রধান কীর্তি। আমাদের আধুনিক নগরবিহারী অভিজাত বাংলাসাহিত্যকে এ হিসাবে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল সর্বজনীন সাহিত্য। যেহেতু সর্বজনের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ, তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই সাধারণ মানুষের জীবনই সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়েছে। আর সে প্রতিফলন ঘটেছে স্বভাবের প্রেরণাতেই, বহিরাগত কোনো উত্তেজনার বশে নয়। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রই সে সাহিত্যের প্রধান সম্পদ্। সে চিত্র অনুজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু তা সদ্য-তোলা অশোধিত সোনার মতোই খাঁটি ও মূল্যবান্। উজ্জ্বল গিল্‌টি সোনার মতো কৃত্রিম ও মূল্যহীন নয়। জনসাহিত্য স্বভাবতঃই হয় কলাকৌশলহীন। তাই আধুনিক বাংলাসাহিত্যের চোখ-ধাঁধানো কলামুগ্ধ চোখে সে সাহিত্যের অপ্রসাধিত শোভা এমন ফিকে ঠেকে। রবীন্দ্রনাথ সে মোহভঙ্গ করার প্রয়াস করেছেন নানাভাবেই। মায়ের মুখের ছেলে-ভুলানো ছড়া, ঠাকুরমাদের ঝুলিভরা গল্পকথা, নাগরিক চোখের অন্তরালচারী কাব্যগাথা, পল্লীগায়কের কণ্ঠবিহারী লোকগীতি, বিশেষতঃ বাউলের গানে তিনি চিরকালই হারামণির সন্ধান করে গেছেন। আরও সন্ধানের জন্য আমাদের প্রবর্তনা দিয়ে গেছেন। বঙ্গভারতীর মণিমালা রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত মণিখণ্ড-গুলিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা কারও অজানা নয়। তারও বহু পূর্বে মধুসূদন বঙ্গভাণ্ডারের অবহেলিত রত্নরাশির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত সাহিত্যে এসব রত্নের মর্যাদা রক্ষায়ও ত্রুটি করেন নি।

একটু মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, আমাদের অতীত বাংলা সাহিত্য যেন জনজীবনের এক আশ্চর্য চিত্রশালা। তার কক্ষে কক্ষে বিচিত্র জীবনের বিচিত্র চিত্রমালা। এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এসেছে। সে দিকে চোখ ফেরালে লজ্জিত বা নিরাশ হবার কারণ নেই। পরের প্রাসাদের ঐশ্বর্য দেখে নিজের কুটিরের অপূর্ব শোভার প্রতি না তাকানোটাই বরং লজ্জার কথা।

এক সময়ে আমার ছাত্রী শ্রীমতী উমা (রায়) সেনের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করেছিলাম। তিনি তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টাকে এদিকে চালিত করে শুধু যে বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন করলেন তা নয়, এতদিন যে আমরা বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ গৌরবের বস্তুকেই উপেক্ষা করে এসেছি, আমাদের সে অপরাধ মোচনেও সহায়তা করলেন। আশা করি বঙ্গজননী তাঁর এই পূজার অর্ঘ্য প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করবেন। আরও আশা করি অতঃপর অতীত বাংলার জনজীবনের পরিচয়সংগ্রহে উৎসাহী গবেষকের অভাব হবে না।

বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস।...তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

—রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮)